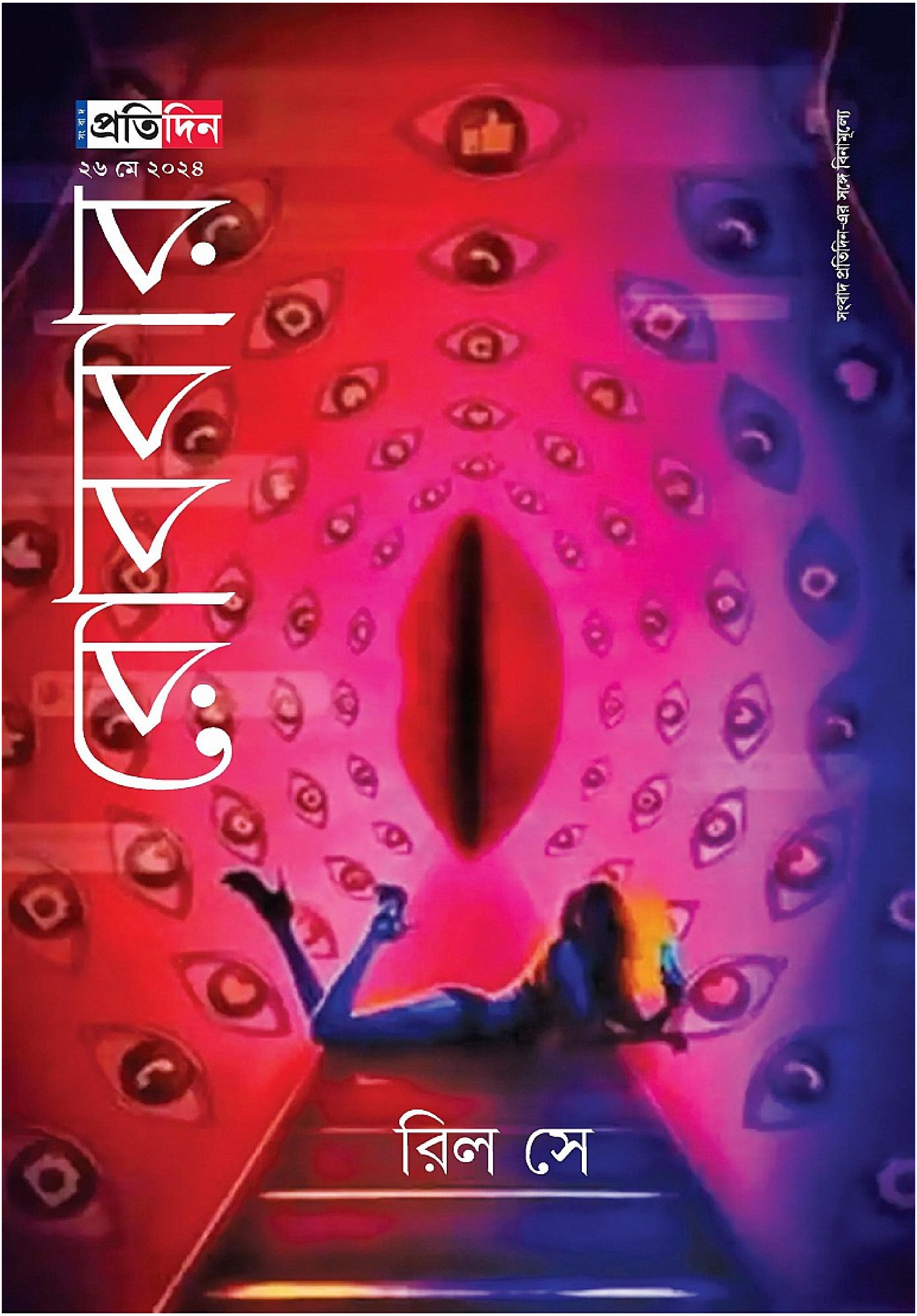


সংবাদ প্রতিদিন
২৬ মে ২০২৪
রোববার
সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে
রিল সে




অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ

Google Play | App Store

উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম

Gifty

# অঞ্জলি জুয়েলার্স

সবার জন্য

নতুন শোরুম
খুলছে কাটোয়া তে

নতুন শোরুমঃ কাঁথি - ওয়ার্ড নং - ২০, দেশপ্রাণ রোড, জলাল খাঁ বাড়, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪০১,
ফোন: ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ । আসানসোল - রেলওয়ে স্টেশন, পার্কিং এরিয়া, এক্সিট গেটের পাশে, ফোন: ৮১৫৯০ ৪১৪২০
আরামবাগ - ওয়ার্ড নম্বর: ১৯, লিংক রোড, গৌরহাটি মোড়, আরামবাগ, হুগলি - ৭১২৬০১, ফোন: ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪

গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোন শাখা নেই।

গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ| anjalijewellerskolkata | anjalijewellersbharat | anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:

Page29/AJ/0524

# সূচিপত্র




২৬ মে ২০২৪

প্রতিদিন

# রোববার


২৫

প্রচ্ছদ 'এলএসডি টু'
ছবির পোস্টার




২৯


৩২

টিম রোববার

নীলাঞ্জনা বোস,
রিংকা চক্রবর্তী,
রাজু সরদার,
প্রিয়ক মিত্র, সোহিনী সেন,
সুপ্রিয় মিত্র, তিতাস,
বিদ্যুৎ রায়,
শান্তনু দে, সুপ্রিয় দাস,
আশিস চট্টোপাধ্যায়,
প্রবীর চৌধুরী,
দেবাঞ্জন নন্দী,
শ্যামল মজুমদার,
সঞ্জয় দাস

সহযোগী সম্পাদক
ভাস্কর লেট

সম্পাদক
অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

## এবার মলাট

### রিল সে



সংবাদ প্রতিদিন-এর
সঙ্গে বিনামূল্যে

magazine.robbar.in

প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

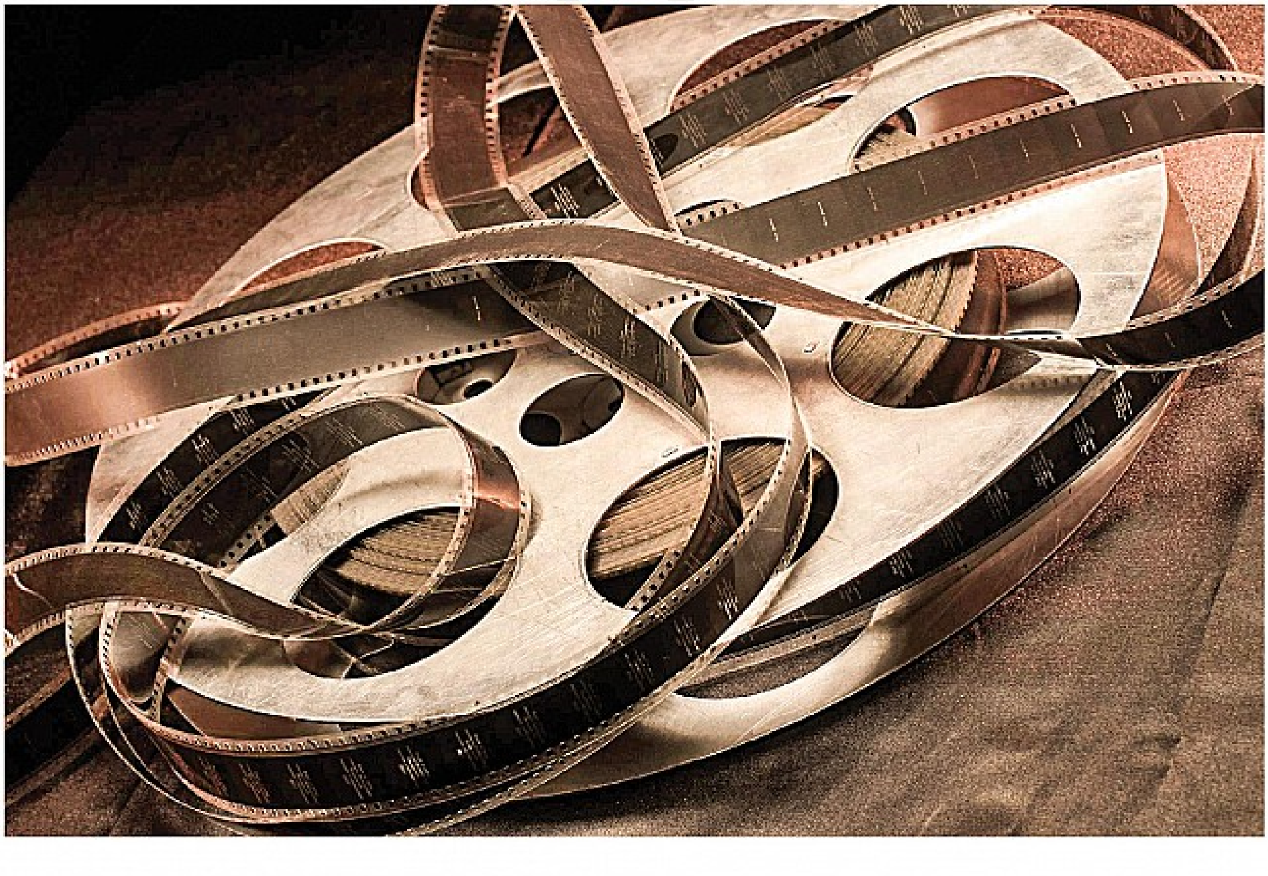
অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

**শীতকালের বেলার মতো সব কিছুই ছোট হয়ে আসছে ক্রমে। সভ্যতার বয়স যত বেড়েছে, খর্বাকৃতি হয়েছে জীবন। সবাই মেতে রিল-রিল খেলায়। এক মিনিটের কম ছোটখাট সব ভিডিও, একটা শেষ হলেই অন্যটা শুরু হয়ে যায়। নেশার মতোই— এক ছিলিম রিলিম।**

‘রিল’ বলতে প্রথমে বুঝতাম সিনেমার রিল। ‘শোলে’ নাকি ছাব্বিশ রিলের ছবি, দু’বার হাফটাইম। ফলে চারিদিকে যখন রিল্‌স নামক শোরগোল উঠল, ভাবলাম বুঝি সিনেমার রিল। ও হরি, এ এক পুঁচকে বুদ্বুদ-সদৃশ ভিডিওবাজি, নাকের বদলে নরুন। সমাজ-কঠিন চশমা চাপিয়ে বললাম, ছেলে-ছোকরাদের কাজ নেই, এসব ফক্কড়ি করছে। অচিরেই জলে ডুববে এই রিল-রিল খেলা।

তারপর অনেকগুলো দিন-মাস-বছর কেটে গিয়েছে। রিল উঠে যায়নি, বরং আমি ঢুকে সেঁধিয়েছি রিলের ভেতর। এক মিনিটের কম ছোটখাট সব ভিডিও, একটা শেষ হলেই অন্যটা শুরু হয়ে যায়। ছিলিমের নেশার মতোই রিলিম। যা ঘিরে ধরে, আচ্ছন্ন করে। মানুষের কথা বলার নতুন এক ভাষা। ফেসবুক জনপ্রিয় হয়ে পরিণত হল এক জ্ঞানগর্ভ জ্যাঠামশাইয়ে। কোথাও কিছু বলার জায়গা নেই, শুধু আছে আপন দেওয়াল। লিখে, বলে, ঝগড়া করে ফেসবুক হয়ে উঠল বিরক্তিকর। ফলে শুধু ছবি পোস্ট করা যায়, এমন কিছুর প্রয়োজন ছিল-ই।

ইনস্টাগ্রাম এসে নবীনদের মুক্তি দিল। চপচপে মতামত-সর্বস্বতার চেয়ে ফুটফুটে ফোটো অনেক নিরাপদ প্রমাণ করে দিল। রিল এল ইনস্টাগ্রামের হাত ধরেই। স্টিল ফোটোগ্রাফকে যদি ‘স্থিরচিত্র’ বলা হয়, তাহলে ‘রিল’-এর ভাল বাংলা হয়তো বা ‘অস্থিরচিত্র’। শুধু কি ফ্যাশন বা স্টাইলে আটকে রইল এই ছোট ছবি? তা কেন? আলিয়া ভাট থেকে শুরু করে প্রিন্সেপ ঘাট সব এল। ধর্মতলায় আর কোনও কর্মখালি রইল না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো করে প্যারাসুট নামিয়ে দিল কল্পনার অরণ্যে। রিলের আওতা থেকে কিছুই বাদ নেই। যে কোনও তাৎক্ষণিক ভাবনা বা ভাললাগা





Enduring Value
SUNRISE®
PURE
বাঙালীর রান্নায়
অন্যতম উপকরণ
সানরাইজ
শাহী গরম মশলা।
লাগে কম,
স্বাদ হয় দারুণ!
SUNRISE®
PURE
SHAHI
GARAM
masala
50 g
সানরাইজ®
শাহী গরম মশলা
রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়
সৃজনশীল পরিবেশনা
সার্ভিং সাজেশান

তৈরি করছে রিল। আমাদের দেশের মনন ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে, রিল দেখলে বোঝা যায় বইকি! ছোটবেলা থেকে আমরা যারা সত্তর প্রজন্ম, তৈরি হয়েছিলাম বিপ্লব দেখব বলে, সেই বিপ্লব শেষমেশ এল মানুষেরই হাতে হাতে, তবে তা রক্তক্ষয়ী পতাকা নয়, মোবাইল রূপে।

ওই এক ম্যাজিক যন্ত্রের হাতে আমাদের সবকিছু জব্দ হয়ে গেল। প্রাথমিক অভ্যেস তৈরি হল, থেকে থেকেই ফোন দেখার। বহুক্ষণ সন্তানকে না-দেখলে যেমন আঁকুপাঁকু করে মন, তেমনই টান মোবাইলের। মাত্র একঘণ্টা বিরতি পেলেও মনে হয়, এই যা, কী সব মিস করে গেলাম। প্রথমে তৈরি হল এই নয়া দর্শন— ক্ষণে ক্ষণে মোবাইল দর্শন। তার-ই হাত ধরে এসেছে রিল। অদৃশ্য ব্রহ্মা বসে আছেন মনের চারদিক ছানবিন করে। যার যেমন প্রেসক্রিপশন। বলিউড, ওয়াইল্ডলাইফ, মেসি-র ককটেল। সব পরপর আসবে। আপনার অনুসন্ধান করা বিষয়ের ভিত্তিতেই। আপনার মনের হদিশ পেয়ে গিয়েছে অজানা নিয়ন্ত্রক। আপনি ভাবছেন, নিজে বেছে নিচ্ছেন পছন্দসই ছবি, বুঝতেও পারছেন না আপনি এলেবেলে। জাদুকর কিন্তু জানে, কোন কার্ডটা আপনি তুলছেন। ফলে আপনি যা দেখতে চান, তা-ই দেখে চলবেন অবিরত, আর ভাববেন এই বেশ ভাল আছি।

শব্দ বা অক্ষরের চেয়ে এই সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা ইমেজ। রিল-ও তাই নতুন চিত্রমালা বা চিত্রহার। পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন নেই এখানে, কারণ সমকালীনতার কিছু নিজস্ব দাবি থাকে চিরকাল, এই খণ্ডচিত্রও সেই জীবন সমগ্রেরই প্রচ্ছদ। যা ছিল মূলত বিনোদন-কেন্দ্রিক, তা এখন কিন্তু রাজনীতির হাতিয়ারও। দেওয়াল লিখন এখন আর প্রচার নয়, বরং রিল-এ বেশিবার দেখতে পাওয়া অনেক বেশি কার্যকর। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের তাই নিজস্ব আইটি সেল, নিজস্ব অ্যালগরিদম্।

**আইনস্টাইনের ছায়া যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাসে, সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি অধ্যাপকদের আরজি পেশ করেছে, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে দিনের পড়ানোটুকু রিল্‌সে প্রকাশ করতে। অধ্যাপকরা রিল্‌সের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবেন ছাত্রদের। কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড!**

এই অবধি তা-ও ঠিক ছিল। কিন্তু এবার প্রবাসে এসে যা শুনলাম, তাতে চমকের আরও অনেক কিছু বাকি। আইনস্টাইনের ছায়া যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাসে, সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি অধ্যাপকদের আরজি পেশ করেছে, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে দিনের পড়ানোটুকু রিল্‌সে প্রকাশ করতে। অধ্যাপকরা রিল্‌সের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবেন ছাত্রদের। কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড! আসলে অস্বীকার করে লাভ নেই, লেখা বা পড়ার চেয়ে দৃশ্যায়ন মাধ্যম হিসেবে এই মুহূর্তে অনেক এগিয়ে। শুধুই নীরব অক্ষর ছোঁয়ার চেয়ে নড়েচড়ে এমন কিছুকে আপন করা সহজ। ফলে, 'রিল সে' মানেই দিল সে।

শীতকালের বেলার মতো সবকিছুই ছোট হয়ে আসছে ক্রমে। কুড়ি ওভারের ক্রিকেটও নাকি এবার চ্যালেঞ্জ ফেস করবে দশ ওভারের কাছে। বড়গল্প নয়, অণুগল্প, নভেল নয় নভেলা। সভ্যতার বয়স যত বেড়েছে, খর্বাকৃতি হয়েছে জীবন। ছোট মাপ, ছোট পরিবার। বৃহতের আয়োজন এখন বাহুল্য মাত্র। প্রত্যেকের এখন নিজের নিজের স্পেস। জায়গা কম পড়লে ক্লাউডের তাকে গুছিয়ে রাখো সব। অ্যাপেল কি জানে ভূপেন হাজারিকার গান, 'ও মালিক সারা জীবন কাঁদালে যখন, আমায় মেঘ করে দাও'!



# বীভৎস অথবা করুণ রস

**যে-দেশে ‘শুচিতা রক্ষা’-র নামে বিয়েবাড়িতে একাসনে দলিতরা বসলে ব্রাহ্মণরা ‘পাপিষ্ঠ’-দের বাড়ির মহিলাদের ধর্ষণ পশ্চাৎ খুন করে গাছ থেকে ঝুলিয়ে দেয়, যে-দেশে বেজাতের ছেলে বিয়ে করলে সম্মানরক্ষার নামে মহিলাদের মাথা কেটে নেয় বাপ-ভাইরা, যে-দেশে মহিলাদের উলঙ্গ করে ঘোরানো হয় জুতো পরে পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার শাস্তিস্বরূপ, সে-দেশে কনটেন্টের নামে মহিলাদের ল্যাংটো করার খেলা চলবে— এ আর এমন কী আশ্চর্যের!**

## অমিতাভ মালাকার

পাড়ার একমাত্র শিক্ষিত মালি বারীনদাকে বরাবর দেখেছি এলাকার আম, সুপারি, নারকেল ইত্যাদি গাছ জমা নিয়ে সংসার নির্বাহ করছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে নির্মিত সমাজে তার মতো শ্রমজীবী মানুষ সিপিএমের বিপ্লব-পরবর্তী শ্রেণিহীন সমাজের আশ্বাসবাণীতে কতখানি সুখী হতে পেরেছিল, সে-তর্কে প্রবেশ না-করেই বলা যায়, ইদানীং ওর মতো অসুখী মানুষ ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় দু'টি নেই। দিনকয়েক আগে ওকে দেখে ছেলেবেলায় পড়া সুকুমার রায়ের ‘স্বভাবেতে সরল সোজা অমায়িক শান্ত বুড়ো’ নন্দ গোসাঁইকে নিয়ে লেখা ছড়ার অন্তিম ছত্রটি মাথায় খেলে গেল: ‘বুড়ো আছে নেই কো হাসি, হাতে তার নেই কো হুঁকো।’

খোঁজ নিয়ে শুনি, একরকম কিশোরী বউয়ের চাপে পড়েই সে বড় মেয়েকে একটি স্মার্ট ফোন কিনে দেয়। দাদার আরও সাত-আটটা ছানাপোনা বিভিন্ন সেক্টরে খাবি খেলেও, এক্ষেত্রে বাঙালি গেরস্তের পুরুষ সন্তানদের ক্রমবিকাশের ধারা মোতাবেক অসম্ভব ত্যাঁদড়, বজ্জাত এবং আহ্লাদের চোটে ‘বিগড়ে হুয়ে শাহ্‌জাদে’ গোছের বছর দশেকের ছোট ছেলেটি-ই সাবজেক্ট। গায়ে কাঁটা দেওয়া প্রাপ্ত তথ্যগুলো মিথ্যে নয় বুঝলাম, কারণ সকলেই বললে ‘কচি’ গত বছর পুজোয় টুনি লাগানো জামা গায়ে আর একটু হলেই শক খেয়ে ফৌত হচ্ছিল, এবং বিভিন্ন ঘাটে চক্কর মেরে কাকিমাদের

স্নান দেখার দুর্নিবার আকর্ষণ সত্ত্বেও সে বারপাঁচেক পাবলিক লিঙ্কিং এড়িয়েছে বাই অ্যান ইঞ্চ। দু'বেলা খোঁটায় বেঁধে জুতোপেটা বাবদ যে খোকা সিধে থাকে, সে অতএব ঘ্যানঘ্যান করে দিদির মোবাইলটি একদিন কিছুক্ষণের জন্য হাতায় এবং রিল বানানোর মহতী প্রচেষ্টায় ঘোষেদের পুকুরে হেলে থাকা তালগাছ থেকে ঝাঁপ দেয়। বিষয়টি ছকে ছিল সর্বপ্রকার জটিলতা সহকারে— 'শিব', 'মহাদেব' হাঁক ইত্যাদি গাজনের গাঁইয়াপনা-বিবর্জিত আর্বান এক্সপিরিয়েন্সের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ-সৃষ্টিই ছিল উদ্দেশ্য। ডাইভের মাঝপথে নিরালম্ব শূন্যে ঝুলে স্লো-মো অবস্থায় ফ্রেমটি রোটেট করাবে, সূর্যের ব্যাকলাইট, জলে পড়ার মুহূর্তে আন্ডারওয়াটার শুটিং, যাতে ভুড়ভুড়ি কেটে বাঁক খাওয়া শরীরের দিওয়ানি আবদাল্লা মার্কা ত্রিভঙ্গটি পাড়াতুতো বেগানি মর্জিনাদের জখম কলিজায় বরাবরের মতো 'ট্যাটুড' হয়ে থাকে।

একটি আধসের গুজনের জালের কাঠি, জর্জসাহেবের নামাঙ্কিত গোটাকতক ফুটো পয়সা, দাঁতে চিবনো চিড়েচ্যাপ্টা মাদুলি এবং নানা সময়ে বন্ধন ছিন্ন হওয়ার নিদর্শন বিশিষ্ট শ'-দুয়েক গিটওয়ালা ঘুনসি দিয়ে ক্ষীণ কটির লগে সম্পর্কযুক্ত হলহলে হাফপ্যান্টের ঘেরটি কেবল সমস্ত হিসেবের বাইরে থেকে যায়। লাফের পূর্ব মুহূর্তে সেটি কেটে নেওয়া পাতার গাঠিতে ফেঁসে গেলে শূন্যপথে যে অর্ধবৃত্তাকার ট্র্যাজেক্টরিটি রচিত হওয়ার কথা ছিল, সেটি গোড়াতেই ব্যাহত হয় এবং কচি সোজা পাড়-বাঁধানো বাঁশের খোঁটায় অবতরণ করে। অঙ্কের স্যর অবনীবাবু বললেন, 'পারপেন্ডিকুলার টু দ্য সারফেস অফ দ্য ওয়াটার।' মাথা, বুক, পেট বেঁচে গেলেও, বাঁ পায়ের বেশ কয়েকটি টুকরোর খোঁজ শুনলাম অদ্যাবধি চলিতেছে।

দুর্ঘটনার ভিডিও আছে— আমি পাড়ার লোক, অথচ সেটি দেখিনি শুনে চায়ের দোকানে 'নিশ্বাসে ফিসফাসে' কথা শুরু হল, 'ভারতীয় অথচ ইন্ডিয়া-পাকিস্তান দেখে না, লিচ্চয় ফরেন এলিয়েন!' তবে কচির উদ্বিগ্ন আত্মীয়র অনেকেই হাসপাতালে চক্কর মারার ফাঁকে ভিডিওটির লাইক এবং শেয়ার নিয়ে খোঁজ চালাচ্ছে, এবং ভাইরাল হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট ফলোয়ার না জোটায় ক্ষোভটি দেখলাম যাকে বলে 'প্যালপেবল্'। কচিকে এখনও বছরখানেক হাসপাতালে থাকতে হবে এই যা ভরসা। শম্বুক গতিতে হলেও কিছু সুচ দর্শক হয়ে ঢুকে ফলোয়ার হয়ে বেরচ্ছে রোজ।

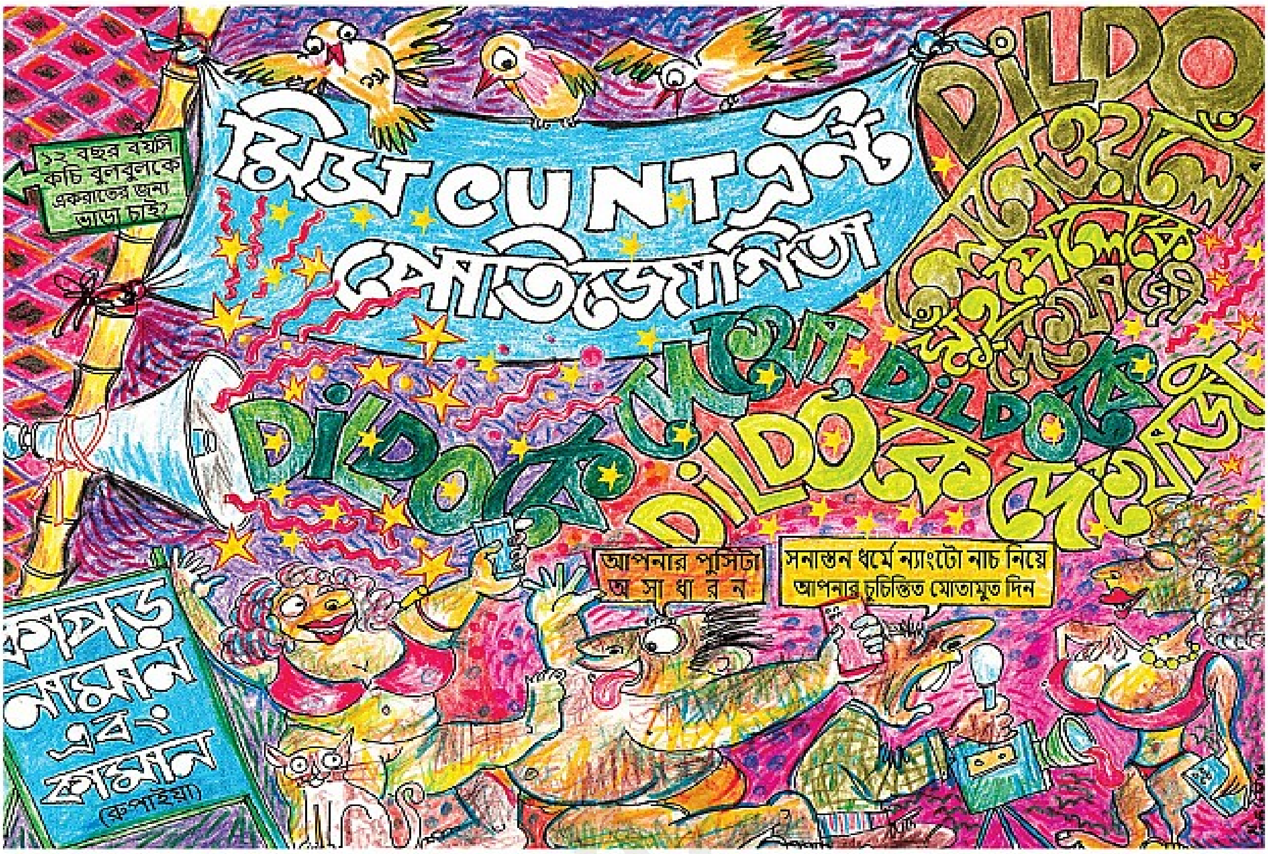
এহ বাহ্য। গল্পটির নটেগাছ এখানেই মুড়োলে পল্লিগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা, ইহজগতে ঈশ্বর ইত্যাদির কৃপা এবং প্রচুর গ্রহরত্ন ধারণ করা সত্ত্বেও অদৃষ্টের পোস্ট কলোনিয়াল ফের সম্পর্কিত দ্বিতীয় কিস্তির সহজবোধ্য পরিসমাপ্তি মেনে নিতাম— নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়। শুনলাম, বারীনদার বড় মেয়েও হাসপাতালে ছিল! বউদি ছেলে-মেয়েকে হাসপাতালে, এবং দাদাকে নিয়ে থানায় ছোটাছুটি সেরে সম্প্রতি বিছানা ধরেছেন।

বছর সতেরোর মেয়েটি পারিবারিক অস্থিরতার সুযোগে বয়ফ্রেন্ডকে বগলদাবা করে ঘরে ঢোকে, উলঙ্গ হয়ে একে-অপরের গায়ে লেপ্টে ভিডিও বানায় এবং অচিরেই হরিদেবপুর আপার প্রাইমারির মাস্টার জীবনবাবুর স্ত্রী সেটি দেখে আর্তনাদ করে ওঠেন, 'এ কী, এ তো আমাদের মিনু!' জীবনবাবু সে-রাতে সাইকেল চালিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বারীনদার দরমা ঘেরা কুটিরের দুয়ারে আছড়ে পড়েন এবং তিনিও যৎপরোনাস্তি আবেগদীর্ণ গলাতেই আর্তনাদ করেছিলেন, 'তখনই বলেছিলাম আর দেরি করিস না, বিয়ে দিয়ে দে।' মিনু পালানোর চেষ্টা করেছিল, তবে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এড়ানো সম্ভব হয়নি। পাড়ার লোক একযোগে থানা ঘুরে ছোকরার বাড়ি গোলমাল পাকাতে গেলে তার মারমুখো বাপ তেরিয়া হয়ে ওঠে, 'তোমাদের মেয়ে কি কচি খুকি? ন্যাংটো হয়ে ঘরে ছেলে ঢোকাচ্ছে, টিকটক বানাচ্ছে, কনটেন্ট আপলোড কচ্ছে... আর যত দোষ আমাদের বাবুর?'

প্রশ্নটি জায়েজ। শুনলাম মিনু এই ধরনের রিল আরও অনেক বানিয়েছে, ফলোয়ার অসংখ্য। 'এই দেখো', একজন মোবাইল ফোনটি বাড়িয়ে ধরল। অসতর্ক থাকায় একঝলক দেখে বললাম 'থাক, থাক।' তারপর অনুসন্ধানের পালা। খানিকটা আত্মানুসন্ধানও বটে। গোড়াতেই যেটা জলবৎতরলং অনুধাবন করলেম, তা হল, জামাকাপড় না-খুললে এই দুনিয়াদারি সামলানো মুশকিল। অনাবৃত বক্ষে শিশুকে মাই দেওয়াই হোক বা আগে থেকে ভেজানো জ্যালজেলে জামা পরে স্নানঘরে মাথায় জল ঢেলে যৌনাঙ্গ প্রদর্শন— ল্যাংটো হতেই হবে আগাপাশতলা। শোয়ার ঘর, ছাদ, তেপান্তর টাইপের মাঠ, ভগ্নস্তূপ, নদীর ধার, পাহাড়, নির্জন সৈকত, স্কুলের লাস্ট বেঞ্চ— কোনও জায়গা বাদ নেই। সর্বত্র সকলে উলঙ্গ শরীর দেখাচ্ছে বেএক্তিয়ার। তারপর সেই ভিডিওয় 'রিল' নামক তকমা জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াতে পারলেই মোক্ষলাভ! প্রথম প্রথম কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না দেশি-বিদেশি অগুনতি পর্নোগ্রাফি সাইটে সমস্তটা— এবং তার চেয়েও কিছু








শিল্পী অমিতাভ মালাকার

অধিক— ফিরিতে দেখার সুযোগ থাকার পরও খুব খারাপ ডিজাইনের প্যান্টি খসিয়ে একঝলক 'কিছুই তো দেখা গেল না' গোছের চামড়া প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় কেন! পরে বুঝলাম, মিনুর বিয়ে দিয়ে যে বিশেষ লাভ হত না— অবিবাহিত কিশোরীর তুলনায় উত্তর-চল্লিশ বিবাহিতদের সংখ্যাটি ঢের বেশি। তাদের যতখানি মাদুলি-বাঁধা হাত আর আলতা-পরা পা বেঁকিয়ে ভীষণরকম ককেটিশ মুখভঙ্গি সহযোগে স্তন-নিতম্ব-যোনি প্রদর্শনেচ্ছা, ততখানিই শাঁখা-পলা-সিঁদুর দেখানোর লোভ। সবাই একই মাল-মেটেরিয়াল একইভাবে দেখিয়ে চলেছে, এবং কেউ বোর হচ্ছে না। একই রসিকতা, একই চিকেন রান্না, একইরকম বেড়ালের বাচ্চা এবং গোল্ডেন রিট্রিভার বিক্রির বাজার তৈরি করছে ব্যবসায়ীরা। সেই এক হিন্দি বলয়ের ডিজে বাজিয়ে খ্যামটা নাচ, এক গরিব পরিবারের মেয়েরা তোবড়ানো গাল আর হাড্ডিসার শরীর দুলিয়ে কোটরে বসা চোখ নাচিয়ে বলছে, 'লম্বর দিইচি চাঁদ, ফলো করো, সব দেখাব।'



আমার যৌনতা নিয়ে ছুঁতমার্গ নেই। অতএব, এই যে-নগ্নতা নিয়ে একটানা আপত্তি জানিয়ে চলেছি, সেই অস্বস্তির কারণটা জানানো দরকার। সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা সেই প্রবল গরমে টাওয়ার অফ সাইলেন্সে কাক-চিলের জন্য ফেলে আসা বুড়ির শুকনো মৃতদেহ উঠে বসার দৃশ্যের বর্ণনা মনে আছে? এই মেয়েদের দেখে হঠাৎ সেই বুড়ির কথা মনে পড়ে গেল। ফাঁকা, অভিব্যক্তিহীন চোখের কোটরে কেবল অসহায়তা আর খড়কুটো আঁকড়ে ধরার আকুতি। যৌন মিলনের আনন্দ নেই, নিজেদের উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই, আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে অর্গ্যাজমের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস নেই। যৌনতা বাধা পড়েছে পেনিট্রেটিভ সেক্সের সীমায়;আর বাকি আবেগ, বোধের ক্ষেত্রগুলিকে গলা টিপে নিকেশের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াটির ভিত মজবুত হচ্ছে রোজ। এর মধ্য দিয়ে মগজে ঈশ্বরের ন্যায় অধিষ্ঠিত যাহা কিছু পারিবারিক তাহার অবিনশ্বর ধাঁচা ছাড়াও, দেশ, ইতিহাস, শিক্ষা, ছেলেমেয়ে মানুষ করা, ভদ্রলোকের বৈঠকখানা, গোমাংসের প্রবেশ নিষিদ্ধ হেঁশেল ইত্যাদি বউ-ঠকখানা, এবং পাকিস্তান, ক্রিকেট, আকসাই চিন, পিওকে, তিরঙ্গা (গুটখা এবং জাতীয় পতাকা) ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক রূপগুলির রং ফিরিয়ে পুনর্নির্মাণ চলছে।

সবজেটে দেওয়ালওয়ালা ঘরের এক কোণে প্লাস্টিকের দরজাওয়ালা বাদ্দুম, ছোট তাকে মাকালী-লোকনাথ-লোক্কি-গণেZ, একপাশে ছাতা এবং পুরীতে কেনা তালপাতার টুপি ঝুলছে, দড়িতে টাঙানো কিছু কাপড়চোপড়, সিলিং ছোঁয়া কারে পাম্পস্টোভের খালি বাসকো, একটা সরোস্সোতির মূর্তি, বিয়ের টোপর, প্লাস্টিকের কভার পরানো আলমারির মাথায় ন্যাগড়া জড়ানো টেবিল ফ্যান, মেঝেয় গোটানো মাদুরের পাশে রাস্তার কল থেকে বয়ে আনা তিন-চার বালতি খাওয়ার জল, পাশে ডাঁই করা বাসনপত্র,

এবং তারই একপাশে চৌকিতে ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে বর-বউ সেলফি স্টিকে মোবাইল ফিট করে কনটেন্ট বানানোর জন্য সেক্স করছে। ছেলে কিছুতেই ঘুমবে না, বারবার এপাশ ফিরে দেখার চেষ্টা করে বাপ-মা কী করছে, আর বরটি কার্যক্রম না থামিয়েই রাগী গলায় বউকে ধমকায়, 'ওপাশ ফিরিয়ে ঘুম পাড়াও।' একই ব্যাকড্রপ, এবং এবার এক তরুণীর স্বমেহনে মজে থাকার অপটু অভিনয়। এবং আবারও সেই একই ব্যাকড্রপ। সেখানে এক বৃদ্ধা ক্লান্ত নিঃসঙ্গ গলায় কুকুরকে আদর করছে। সব 'কনটেন্ট'। সব 'Cunt-এন্ট'।

আদতে অন্য একটা ভার্চুয়াল জগতে পালানোর চেষ্টা করছে সকলেই। কোনওভাবে বিশ্বাস জন্মেছে যে, একবার পর্নোগ্রাফির দুনিয়ায় প্রবেশ করলে সবার সানি লিওনি বা নোরা ফতেহির মতো থাই, স্তন, নিতম্ব হবে। তারপর স্তন্তনে যে সুখ, তা শুধু হোল মিল্ক এবং শুদ্ধ গোমূত্র পান করে পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দিতে হামেহাল তৈয়ার হৃষ্টপুষ্ট নিরামিশাষী জোয়ানদেরই ললাট-লিখন। তাদের ছানাপোনারা ওইরকম ফরসা জন্মাবে, সেই বাচ্চাদের সানি লিওনির উদারচেতা বরেদের মতো ফরসা পুরুষরা দেখাশোনা করবে আর বাড়ির বাগানে খেলে বেড়াবে হাজার হাজার গোল্ডেন রিট্রিভার। যে-দেশে 'শুচিতা রক্ষা'-র নামে বিয়েবাড়িতে একাসনে দলিতরা বসে পড়লে ব্রাহ্মণরা 'পাপিষ্ঠ'দের বাড়ির মহিলাদের ধর্ষণ পশ্চাৎ খুন করে গ্রামের প্রবেশপথে গাছ থেকে ঝুলিয়ে দেয়, যে-দেশে বেজাতের ছেলে বিয়ে করলে সম্মানরক্ষার নামে মহিলাদের মাথা কেটে নেয় বাপ-ভাইরা, যে-দেশে মহিলাদের উলঙ্গ করে ঘোরানো হয় জুতো পরে পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার শাস্তিস্বরূপ, সে-দেশে কনটেন্টের নামে মহিলাদের ল্যাংটো করার খেলা চলবে এ আর এমন কী আশ্চর্যের!

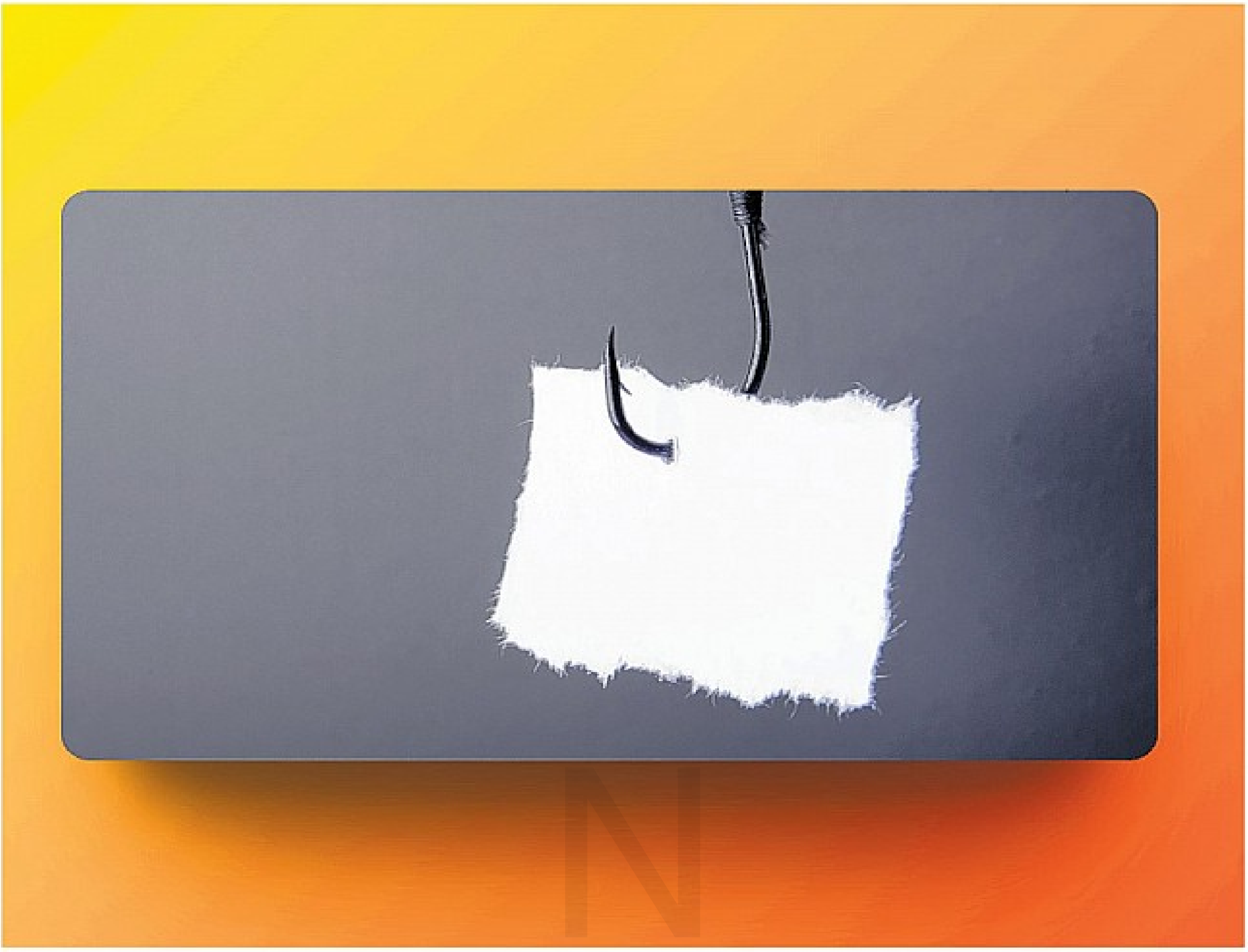
**যে-দেশে প্রায় বিশ কোটি মহিলা অর্থাভাবে কাপড় কিনতে পারে না বলে দিনের বেলায় খোঁদলে কোটরে লুকিয়ে থাকে, যে-দেশে কাপড় না খুললে নায়িকাদের নামের পিছন থেকে 'সাহসী' শব্দটি বাদ পড়ে যাওয়ার ভয়, সে-দেশে নগ্নতাকে লজ্জার একমাত্র কারণ হিসেবে মেনে নিতে শিখিয়ে ল্যাংটো করার কনটেন্ট বানিয়ে মজা নেওয়া চলছে।**

তবে যারা কাপড় পরার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তাদের ঘোমটা যেন হাঁটুর ওপরে না ওঠে— খুব সাওধান! শিশুরা অপুষ্টিতে মারা যাক ক্ষতি নেই, খাদ্যশস্য, দুধ, ডিম আরব সাগরে ফেলতে লজ্জা পেও না। শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ কমাতেও লজ্জা পাওয়ার দরকার নেই। যে-দেশে প্রায় বিশ কোটি মহিলা অর্থাভাবে কাপড় কিনতে পারে না বলে দিনের বেলায় খোঁদলে কোটরে লুকিয়ে থাকে, যে-দেশে কাপড় না-খুললে নায়িকাদের নামের পিছন থেকে 'সাহসী' শব্দটি বাদ পড়ে যাওয়ার ভয়, সে-দেশে নগ্নতাকে লজ্জার একমাত্র কারণ হিসেবে মেনে নিতে শিখিয়ে ল্যাংটো করার কনটেন্ট বানিয়ে মজা নেওয়া চলছে। কনটেন্টের খুবসুরতি সেখানেই— বীভৎসতাও। এই বৈপরীত্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। লজ্জা পাওয়ার কারণ এবং হায়া-শরম না থাকা আদতে এক— সাহস দেখাতে হলে ভার্চুয়াল জগতে দেখাও, পুনোরুৎপাদনের যুক্তিতে কাপড় খোলো-পরো যা খুশি করো, কেবল সমবায় আন্দোলন, কারখানায় ইউনিয়ন, সরকারি সম্পত্তি বিক্রির প্রতিবাদ এবং খাদ্যসুরক্ষার দাবি ক'রো না।

কচি তালগাছ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল স্কাইডাইভিংয়ের অনুকরণে, আর মিনুও যে মিয়া খলিফা হতে চায়নি— কেই-বা বলতে পারে!

বাকিটার অস্তিত্ব নেই।

আমাদের আছে?



# আলাদিনের দৈত্য

‘রিল’। এই মুহূর্তে সারা দুনিয়াকে বশ ও অবশ করে রেখেছে এই খুদে শব্দটি। ‘মেটা’-র হিসেব অনুসারে, দুনিয়া জুড়ে দৈনিক ২০০ বিলিয়ন রিল দেখা হয়, অর্থাৎ, ২০ হাজার কোটি! সমীক্ষা বলছে, ২০২৫ নাগাদ এদেশের প্রতি চারজন আন্তর্জাল ব্যবহারকারীর তিনজনই দেখবে এই ছোট ভিডিওগুলি। এবং যারা সক্রিয়ভাবে নিয়মিত ইন্টারনেট ঘাঁটে, তারা দৈনিক ৫৫ থেকে ৬০ মিনিট কাটাবে রিল দেখে। তার অর্ধেকের বেশিই হয়তো হবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টিয়ারের শহরগুলিতে।

অতনু বিশ্বাস

ছদ্মনামে বিস্তর বই লেখা হয়েছে। কিন্তু কোনও বইয়ের লেখকের নামের জায়গায় যদি দেওয়া থাকে ‘নো ওয়ান ইম্পর্ট্যান্ট’, তাহলে কেমন হয়? বিশেষ করে যে-বইটার আবার উদ্দেশ্য কিনা তার পাঠককে ‘ইম্পর্ট্যান্ট’ করে তোলা!

২০২০-তে কিন্তু এমনই এক লেখক বা লেখক দলের লেখা একটি বই প্রকাশিত হয়, বইটির নাম ‘ইউজিং ইনস্টাগ্রাম রিল্‌স: দ্য সিক্রেট সস ফর হায়েস্ট রিল্‌স এনগেজমেন্ট অ্যান্ড হোয়াই ইউ নিড টু ডু দিস নাও’। হ্যাঁ, সদ্যই তখন চালু হয়েছে ‘রিল’। ফিড ভিডিও, স্টোরি, লাইভ, এসবের চাইতে রিল খানিকটা স্বতন্ত্র। গঠনে, ব্যাপ্তিতে, হয়তো বা তাৎক্ষণিক প্রভাবের দিক থেকেও। রিল হল ইনস্টাগ্রাম-ফেসবুকের বিশেষ ছোট ভিডিও, যার সৃষ্টিই হয়েছে টিকটকের সঙ্গে জুঝতে। এটি




একটি ক্লিপ, কিংবা একাধিক ক্লিপ একসঙ্গে সম্পাদনা করে তৈরি। রিলের ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ, ৯০ সেকেন্ড পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে এই ভিডিও। টিকটকের মতোই এই ভিডিও ক্লিপে যোগ করা যায় গান, অনস্ক্রিন পাঠ্য, ক্যাপশন এবং ভিজুয়াল এফেক্ট।

বোঝাই যাচ্ছে, রিলের সেই আদি-পর্বে রিল বানানোর হাল-হকিকত এবং কীভাবে তা ভাইরাল হতে সাহায্য করতে পারে, তা বোঝানোই ছিল 'নো ওয়ান ইম্পর্ট্যান্ট' শীর্ষক লেখক বা লেখক দলের উদ্দেশ্য। পরবর্তী কালে অবশ্য রিল বানানোর কায়দাকানুন নিয়ে বই বেরিয়েছে আরও। মূলত ছোট ব্যবসায়ী, উদীয়মান নির্মাতা এবং নতুন বিপণনকারীদের জন্য ইনস্টাগ্রাম রিল বানানোর নির্দেশিকা নিয়েই বইগুলি লেখা।

ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এখন ছোট-ছোট ভিডিও ছড়াছড়ি। সোশ্যাল মিডিয়ার জগতে যেসব মানুষের একেবারে আনাগোনা নেই, তারা ছাড়া আর কারও পক্ষেই এই ভিডিওগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। খেলা থেকে রাজনীতি, যোগ থেকে বিয়োগ, পটল থেকে পেট্রোল, চাকরি চুরি থেকে বউ চুরি— যে কোনও কিছুই হতে পারে রিলের বিষয়বস্তু। বিরাট কোহলি থেকে শচীন তেন্ডুলকর, কাব্য মারান থেকে প্রীতি জিন্টা, অক্ষয় কুমার থেকে রশ্মিকা মন্দানা, নামজাদা রাজনীতিক থেকে সাধারণ মানুষ, তাদের জীবন, চিন্তা, মজা, এমনকী, মনুষ্যেতর প্রাণী, জনপ্রিয় কার্টুন, মুভি— সব-ই হয়ে উঠতে পারে এর বিষয়, এর চরিত্র। কম্পিউটার কিংবা স্মার্টফোনে দু'-চারটে ক্লিকেই তৈরি হয়ে যেতে পারে রিল। অতি সহজেই। এজন্য বিশাল কোনও পারদর্শিতার প্রয়োজন নেই। আপনি-আমি সকলেই হয়ে যেতে পারি ছোট ভিডিও নির্মাতা, স্ক্রিপ্টরাইটার, নির্দেশক— একযোগে সব।

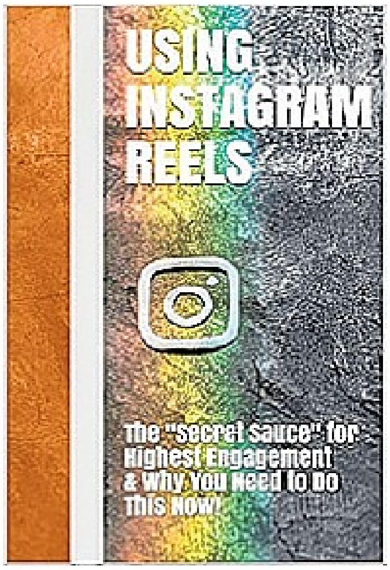
একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন দুনিয়া সাংঘাতিক ভাবে বদলে দিয়েছে আমাদের জীবনের স্পন্দন। ক্রমশ তা আরও বদলাচ্ছে। কোনও এক খরগোশের গর্ত গলে কখন যেন আমরা ঢুকে পড়ছি এক ভার্চুয়াল, মায়াময় জগতে। এখানেই কিন্তু মডার্ন অ্যালিসের গল্পটা শেষ নয়, বরং তা শুরু হয় জমিয়ে। কারণ, সেই ওয়ান্ডারল্যান্ডে আমরা নিত্যদিন নতুন-নতুন করে

অবাক হতে থাকি। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় আমাদের অস্তিত্ব ভেঙেচুরে নবতর রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে নিত্যদিন। সেখানে আর সব কিছুর সঙ্গে বাণিজ্যও চলতে থাকে বিনোদন এবং বিজ্ঞাপনের যৌথ মোড়কবন্দি হয়ে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা 'কনটেন্ট' তৈরি করে, তাদের অন্যতম পছন্দের প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রাম। প্রথম দিকে কেবল দীর্ঘ ভিডিও-ই পোস্ট করা যেত ইনস্টাগ্রামে, যার দর্শক-সংখ্যা এবং ব্যাপ্তি— দুই-ই ছিল সীমাবদ্ধ। সীমানা ভাঙল রিল তথা ছোট ভিডিও আসার পর, ২০২০-তে। মনে রাখতে হবে, অতিমারী এবং তার ফলশ্রুতিতে আমাদের মাত্রাতিরিক্ত ডিজিটাল-নির্ভরতা সংশ্লিষ্ট সময়কালের বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে এদেশের প্রেক্ষিতে সময়টা অন্যভাবেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খেয়াল করলে দেখা যাবে, তার ঠিক আগেই টিকটক নিষিদ্ধ হয়েছে এদেশে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করে মাত্রাতিরিক্ত জনপ্রিয়তা পেয়ে গেল ইনস্টাগ্রাম 'রিল'।

'মেটা'-র হিসেব অনুসারে দুনিয়াজুড়ে নাকি দৈনিক ২০০ বিলিয়ন রিল্‌স দেখা হয়, অর্থাৎ ২০ হাজার কোটি। ইনস্টাগ্রামের প্রায় দুই বিলিয়ন অ্যাকাউন্টের প্রায় এক-চতুর্থাংশই আবার ভারতে। আর এদেশে এই রিল্‌সের জনপ্রিয়তা কীরকম লাফিয়ে বাড়ছে, তার একটা অনুমান পাওয়া সম্ভব 'বেইন অ্যান্ড কোম্পানি'-র একটা সাম্প্রতিক হিসেব থেকে। সেখানে জানা যায়, ২০২৫ নাগাদ এ-দেশের প্রতি চারজন আন্তর্জাল ব্যবহারকারীর তিনজনই দেখবে এই ছোট ভিডিওগুলি। এবং যারা সক্রিয়ভাবে নিয়মিত ইন্টারনেট ঘাঁটে, তারা দৈনিক ৫৫ থেকে ৬০ মিনিট কাটাবে রিল্‌স দেখে। তার অর্ধেকের বেশিই হয়তো হবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টিয়ারের শহরগুলিতে।

রিল্‌স বদলে দিয়েছে কনটেন্ট তৈরির প্রকরণও। এবং তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকা ব্যবসার সম্ভাবনাকেও। এটা চালু হওয়ার পর থেকে উপভোক্তাদের গড়ে ইনস্টাগ্রামে কাটানো সময় বেড়েছে ৪০ শতাংশ। সঙ্গে বেড়েছে মেটা-র ব্যবসাও। ২০২৩-এর শেষ কোয়ার্টারে মার্ক জুকারবার্গ বললেন, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক— উভয় মাধ্যমেই খুব ভাল কাজ চালিয়ে যাচ্ছে রিল বিষয়টা। মানুষ প্রতিদিন সাড়ে তিন বিলিয়ন বার পুনরায় শেয়ার করছে সেগুলো। এবং সমস্ত অ্যাপের ক্ষেত্রেই নেট আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে রিল। আবার রিল্‌স নাকি কনটেন্ট তৈরিকে




'গণতান্ত্রিক' করে তুলেছে— এমন উচ্চারণও করছে অনেক বিশেষজ্ঞ।

রিল বিষয়টার মধ্য দিয়ে মানুষের নিত্য-প্রবহমান সতত পরিবর্তনশীল সংস্কৃতির রূপশৈলীও প্রতিফলিত হচ্ছে বেশ খানিকটা। সঙ্গে উপভোক্তাদের

**২০২৩-এর শেষ কোয়ার্টারে মার্ক জুকারবার্গ বললেন, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুক— উভয় মাধ্যমেই খুব ভাল কাজ চালিয়ে যাচ্ছে রিল বিষয়টা। মানুষ প্রতিদিন সাড়ে তিন বিলিয়ন বার পুনরায় শেয়ার করছে সেগুলো। এবং সমস্ত অ্যাপের ক্ষেত্রেই নেট আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে রিল। আবার রিল্‌স নাকি কনটেন্ট তৈরিকে 'গণতান্ত্রিক' করে তুলেছে— এমন উচ্চারণও করছে অনেক বিশেষজ্ঞ।**

আচরণকে রূপ দিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে সেগুলি। বিভিন্ন ব্র্যান্ড এবং তাদের ব্যবসায়ীর মধ্যে তৈরি করছে সেতু। অটোমোবাইল থেকে শুরু করে সৌন্দর্যচর্চার সামগ্রী, বিনোদন, অর্থনৈতিক, ফ্যাশন, ভ্রমণ বা প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্র্যান্ড এখন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে এই রিল প্রযুক্তি। ২০২৩-এর মার্চে মেটা ঘোষণা করে 'মেড অন রিল্‌স' নামে এক প্রোগ্রাম, যা অর্থকরীভাবে কনটেন্ট নির্মাতাদের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত করেছে ব্র্যান্ডগুলিকে। 'আমাজন' হোক বা 'তানিষ্ক', 'মারুতি' থেকে 'ক্যাডবেরি'— নামজাদা সব ব্র্যান্ড কাজ করে চলেছে এই ফরম্যাটের জন্য 'কনটেন্ট' উদ্ভাবনে।

পাশাপাশি, অনিবার্যভাবেই হইহই করে ঢুকে পড়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। শুধু রিল্‌স তৈরিতে নয়, উপভোক্তা কোন রিল বা কনটেন্ট দেখবে, সে-সংক্রান্ত সুপারিশের জন্যও। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশ্লেষণের সাহায্যে সুপারিশ পদ্ধতির ফলশ্রুতিতে নাকি এ-বছর ফেসবুকে উপভোক্তাদের সাত শতাংশ সময় কাটানো বেড়েছে, ছয় শতাংশ বেড়েছে ইনস্টাগ্রামের ক্ষেত্রে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের ফলে যে-ছবি বা ভিডিও তৈরির গুণমান বা বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও বিপ্লব আসছে, তা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না?

আচ্ছা, রিল ব্যাপারটা ঠিক আলাদা কোথায়? খেয়াল করলে দেখা যাবে, 'রিল্‌স' এবং 'স্টোরি'-র (এটিও ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) উত্থান যেন এক ভূকম্পের মতো— অন্তত নির্মাতা এবং ব্র্যান্ডগুলির দর্শকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে তো বটেই। এখনকার দুনিয়ায় নতুন অনুগামীদের আকৃষ্ট করতে, ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহক টানতে এমন সহজ, সস্তা এবং কার্যকর মাধ্যম আর আছে কি না সন্দেহ। রিল যেন গল্প বলার জন্য একটি ক্যানভাসের জোগান দেয়। এ যেন সৃজনশীল অভিব্যক্তি প্রকাশের এমন এক ময়দান— যেখানে রয়েছে স্বজ্ঞাত সম্পাদনার উপায়, সঙ্গে ট্রেন্ডি মিউজিক লাইব্রেরি এবং অগমেন্টেড রিয়্যালিটি (এআর) ফিল্টার, নতুন নতুন সব উপাদান। এবং এর সাহায্যে যে কেউ বানাতে পারে তথ্যপূর্ণ টিউটোরিয়াল, জীবনের চিত্তাকর্ষক স্নিপেট-গুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে, এমনকী, রিল্‌সের মাল্টি-ক্লিপ ফরম্যাট ব্যবহার করে বোনা যেতে পারে আকর্ষণীয় আখ্যান। সেও তো এক মস্ত সুবিধে! অদ্ভুত এক সৃজনশীল স্বাধীনতা, যা





রিল। সামাজিক ভারসাম্যহীনতার পরিচায়ক

নিজেকে এবং নিজের পছন্দের বিষয়গুলিকে বহুজনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে সাহায্য করে। এক বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অঙ্গ হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করার এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার পদ্ধতির জোগান দেয়। সব মিলিয়ে নতুন, আরও ভাল কোনও প্রযুক্তি আসার আগে পর্যন্ত এর সম্ভাবনা অফুরান।

রিল্‌স হয়তো এখনকার সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা মহাপ্লাবনের ন্যায় ভেসে যাওয়া জীবনযাত্রার একটা পর্যায়। স্থিরচিত্র, লেখা, ইত্যাদিও তো বেশ কাটে সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে। তবে রিল যে প্রবলভাবে তাতে থাবা বসাচ্ছে— সে-বিষয়ে সন্দেহ কম।

ওই যে বললাম, ইনস্টাগ্রাম অ্যাপের সাহায্যে রিল বা স্টোরি তৈরি করা খুবই সহজ। রিল দিতে পারে এক নতুন বাজার— নতুন জনগোষ্ঠীর কাছে। কারণ তা এমন সব গ্রাহককে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা ধরে, যাদের কাছে সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়াতে ঐতিহ্যগত স্ট্যাটিক পোস্টের মাধ্যমে পৌঁছনো কঠিন। তাই আগেই বলেছি, সম্ভাব্য উপভোক্তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এক অভূতপূর্ব মাধ্যম রিল।

মোট কথা, এখন রিলের ঘূর্ণাবর্তে দুনিয়া ঘুরছে। এ যেন চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান দুনিয়ার-ই চালচিত্র। অক্সফোর্ড ডিকশনারি ঘেঁটে দেখেছি, ‘রিল’ শব্দটা ৬০০ বছরেরও বেশি পুরনো। শব্দটিকে কলিন্‌স ডিকশনারি অবশ্য ব্যাখ্যা করেছে যে, যদি কারও মস্তিষ্ক বা মন ঘুরপাক খায়, তার অর্থ, তিনি খুব বিভ্রান্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া অজস্র ‘রিল’ নিয়ে এই ধরনের বিভ্রান্তি কিন্তু বিস্তর। এই সমস্ত ভিডিওর কিছু বেশ ভাল। কিছু তো অতি চমৎকার। তাদের নির্মাতাদের চিন্তাপদ্ধতি আর প্রতিভা দেখে অবাক হতে হয়। কিছু রিল কিন্তু বেশ সাদামাঠা। অনেকগুলো আবার অর্থহীন, কিংবা বড্ড খারাপ, রুচি, বিষয়বস্তু ইত্যাদির মাপকাঠিতে। অবশ্য রুচি তো ব্যক্তিভেদে বদলায়। তাই আমার কাছে যা নিম্নরুচির, তা অন্য অনেকের কাছে সেরকম নাও হতে পারে। আর নিজের রুচিই যে শ্রেষ্ঠ, এমন দাবি বোধ করি আমরা করতে পারি না কেউ-ই।

এ-কথাও ঠিক যে, সমাজভেদে অনেক রিলই বোধ করি শ্লীলতা-অশ্লীলতার ধূসর সীমানায় ঘোরাফেরা করে। আবার অনেক রিল সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় ভারসাম্য এবং সংহতি ব্যাহত করতে পারে। তবে এসব তো থাকবেই। যেমন, গল্প-উপন্যাসও তো লেখা হয় প্রচুর। তার মধ্যে খুব ভাল সামান্যই। পাতে দেওয়ার মতো থাকে আরও কিছু। কিন্তু বাজে লেখা কিংবা বটতলা-মার্কা লেখাও তো অনেক থাকে। এটা বোধ করি প্রযোজ্য যে কোনও ক্ষেত্রের সৃষ্টিতেই। তাই সোশ্যাল মিডিয়া, বা এক্ষেত্রে তার ছোট-ছোট ভিডিওকে, আলাদা করে কাঠগড়ায় তুলে লাভ নেই। বরং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর রিল্‌স তৈরি, সেগুলি ‘পোস্ট’ করা কীভাবে আটকানো যায়, সেটাই ভাবা দরকার।

সমস্যা হল, সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আইনকানুন নানা দেশেই অস্পষ্ট, এবং অনেক ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত। আসলে, এমন দ্রুত লয়ে এর বিস্তার এবং বিকাশ ঘটে চলেছে যে, তার সঙ্গে পাল্লা দিতে চলতি আইনগুলি হিমশিম খাচ্ছে। তাই প্রয়োজন দ্রুত যথোপযুক্ত আইনের প্রচলন এবং তার প্রয়োগ। কিন্তু দ্রুত বিকশিত হতে থাকা সোশ্যাল মিডিয়ার নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগের সঙ্গে তা পাল্লা দেবে কীভাবে? সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলিরও দায়িত্ব, এই আইন যাতে যথাযথ প্রয়োগ হয়— তা দেখার। পোস্টগুলোকে শালীনতা এবং সামাজিক ভারসাম্যের ছাঁকনিতে ছাঁকার। কিন্তু সেও বোধ করি খুব সহজ নয়। আলাদিনের দৈত্য একবার বোতল থেকে বেরলে তাকে পুনরায় বোতলে ঢোকানোর ক্ষমতা কি এই কোম্পানিগুলোরও আছে?

এই লেখা লিখতে-লিখতেই মনে হল, নিজের অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ জীবনটার টানাপোড়েন আর তার স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসা, ভাল লাগা, অপারগতা, অপূর্ণতা নিয়ে অনূর্ধ্ব ৯০ সেকেন্ডের একটা রিল বানালে কেমন হয়? আমাদের মতো ‘নো ওয়ান ইম্পর্ট্যান্ট’-এর নিজের কাছে ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে ওঠার অণুগল্প!

‘লাইফ ইন আ রিল’ আর কী! ‘জীবন’ নামের হুপ রোলিংয়ের এক চক্রাকারে ঘুরতে থাকা অসাধারণ কক্ষপথের রিলের কিছু স্ন্যাপশট।

তবে তা শুধুমাত্র আমার ফিরে দেখা আর আমার প্রিয়জনদের পর্যালোচনার জন্যই।

# ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’

**রিল্‌স বা শর্টসের নেশা এখনকার দিনে মাদকের থেকে কোনওমাত্রায় কম নয়। স্থায়ী চাকরির সাংঘাতিক অপ্রাচুর্য ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা, বিশেষ করে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আয়ের বিভিন্ন বিকল্প উৎস খোঁজার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে ব্যাপকভাবে। এই নেশামুক্তির একমাত্র উপায় বোধহয় ঠিক জায়গায় থামতে শেখা, বিরতি নেওয়া, ঠিক সময়ে।**

**স্বাগতম দাস**

২০২৪-এর পৃথিবীতে আমরা, যাদের নাগালে আছে স্মার্ট ফোন, প্রায় সবাই একটা দ্বৈত সত্তায় অবস্থান করছি— এক, আমাদের রক্তমাংসের অস্তিত্ব, যাকে বাস্তব বলে ভাবতে শিখেছি শিশুকাল থেকে, আর দুই, অদৃশ্য আন্তর্জালে ছড়ানো একটা ডিজিটাল মায়াজগতে আমাদের বিমূর্ত অস্তিত্ব— যেখানে আমরা শুধুই কিছু সংখ্যার জটিল বুননে চিহ্নিত থাকি। প্রথম অস্তিত্বে আমরা কোনও-না-কোনও দেশের নাগরিক বা সিটিজেন, আর দ্বিতীয়টিতে দেশের সীমানা ডিঙিয়ে বিশ্বজোড়া বিভিন্ন সমাজ-মাধ্যমের নেটিজেন।

এই আশ্চর্য নেটপাড়ার বাসিন্দাদের প্রায় ৬০ শতাংশ-রই বয়েস ৩০-এর নীচে। দিন-রাতের যে সময়টা ঘুমের বাইরে, এদের সেই সময়ের অনেকটা অংশ কেটে যায় স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে বুড়ো আঙুল চালাতে চালাতে। সেই আঙুলের ছোঁয়ায় মাত্র ৩০ কি ৪০ সেকেন্ডের জন্য খুলে যেতে থাকে একের পর এক জাদু-দরজা— সেইসব দরজার পিছন থেকে বেরিয়ে আসে চেনা-অচেনা আরও কত সহনাগরিকের অদ্ভুত সব কীর্তিকলাপ, কেউ অতি দ্রুত চমকপ্রদ কিছু রান্না করে ফেলছেন, কেউ বিদ্যুৎগতিতে খেয়ে ফেলছেন বিড়াল-ডিঙনো ভাত কি কোরিয়ান নুডলস, কেউ বন্ধুদের সঙ্গে পৃথিবীর কোনও দুর্দান্ত কোণে বেড়াতে বেড়াতে



শোনাচ্ছেন তাঁর অভিজ্ঞতা, কেউ-বা দেখাচ্ছেন বিরাট হাঁড়িতে রান্না বিরিয়ানির ওপর এক কিলো ঘি ঢালার দৃশ্য, কেউ বোঝাচ্ছেন 'জয় শ্রীরাম' বলতে অস্বীকৃত হলে কেন পাকিস্তানে গিয়ে থাকা উচিত, আবার কেউ কেউ উৎকট পোশাক পরে অশ্লীল কিছু দৃশ্যের জন্ম দিচ্ছেন।

ব্যাপারটা একতরফা নয় মোটেই। আন্তর্জালে আটক তরুণ-তরুণীরাই যে শুধু এইসব 'রিল্‌স' বা 'শর্টস' নামক স্বল্পস্থায়ী ভার্টিকাল ভিডিওগুলো দেখছে তা নয়, এইসব ভিডিও-র নেপথ্যে থাকা, কৃত্রিম মেধা-নিয়ন্ত্রিত স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলিও নজর রাখছে দর্শকদের ওপরে। সযত্নে বুঝে নিচ্ছে উপভোক্তা কী ধরনের রিল্‌স দেখছে ১৫ সেকেন্ড বা তার বেশি সময়। সেই অনুযায়ী পরেরবার তার বুড়ো আঙুলের নাগালে সাজিয়ে দিচ্ছে সমগোত্রীয় আরও কনটেন্ট। যে যেমনটা চায়— রাজনীতি, যৌনতা, ব্যায়াম, রান্না, বেড়ানো থেকে এমনকী, পারিবারিক ঝগড়ার সাজানো মুহূর্ত-ও।

গোটা ব্যাপারটার শুরুটা খতিয়ে দেখতে গেলে আমাদের চলে যেতে হবে সেই ২০১১ সালের জুলাই মাসে, যখন প্রথমবার নেট-নাগরিকদের নাগালে এসে গেল স্ন্যাপচ্যাট নামের বার্তা বিনিময়কারী একটি মোবাইল অ্যাপ। এই অ্যাপে গ্রাহকেরা তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের ১০ সেকেন্ডের ছোট্ট ছোট্ট ভিডিও বা কিছু ছবি পাঠাতে পারতেন, যা অন্যপক্ষ দেখে নেওয়ার পরেই মুছে যেত। বয়সে নবীন উপভোক্তাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল এই অ্যাপ। কিছুদিনের মধ্যেই স্ন্যাপচ্যাট তাদের সফলতম অধ্যায়-টি নিয়ে আসে পৃথিবীর সামনে, নেটপাড়াকে পরিচয় করিয়ে দেয় 'স্টোরিজ'-এর ধারণাটির সঙ্গে। পরস্পর সম্পর্কিত কিছু ছবিকে জুড়ে দিয়ে, নেপথ্যে পছন্দমতো সংগীত সংযোজন করে নিজেদের জীবনের কিছু ছোট্ট গল্পকে কথায়, ছবিতে ও সুরের মাধ্যমে বাকিদের সামনে মেলে ধরার রাস্তা খুলে যায় বেশ কয়েক মিলিয়ন মানুষের কাছে। অবাক লাগলেও, স্ন্যাপচ্যাটের সেই প্রাথমিক উল্কা গতিতে বৃদ্ধির শেষটিও এখান থেকেই সূচিত হল। অচিরেই ইনস্টাগ্রাম নিয়ে এল তাদের নিজস্ব 'স্টোরিজ'-এর সংস্করণ, প্রতিদিনের জীবন থেকে বাছাই করা কিছু মুহূর্ত বাছাই করা বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সেই আরও আকর্ষণীয় ও সহজ পথের সন্ধান স্ন্যাপচ্যাটের 'স্টোরিজ'-কে প্রায় লাটে তুলে দিয়েছিল।

আমার আপনার আয়তক্ষেত্রাকার ফোনটির সাপেক্ষে চিরাচরিত ল্যান্ডস্কেপ ভিডিও শুট করা হয় আনুভূমিকভাবে দেখার জন্য। এর ফলে, আইফোনের স্ক্রিনে ল্যান্ডস্কেপ ভিডিও-র পুরোটা দেখতে গেলে ফোনটিকে উল্লম্ব অবস্থা থেকে ঘুরিয়ে আনুভূমিক করে নিতে হয়। এই ঘোরানোটুকু এমন কিছু আহামরি নয় বলে মনে হলেও, এই অতিরিক্ত কাজটি করতে হচ্ছে বলেই শুধু পরিসংখ্যানগতভাবে আমাদের ভিডিও কনটেন্ট দেখার সম্ভাবনা কমে যায় উল্লেখযোগ্য রকমের। 'ব্রেড-এন-বিয়ন্ড'-এর একটি বিস্তৃত ইনফোগ্রাফিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ৩০%-এর কম ব্যবহারকারী বিজ্ঞাপন দেখার জন্য তাদের ফোন ঘুরিয়ে দেখেন, এবং যাঁরা ঘোরান, তাঁদের মধ্যে গড়ে মাত্র ১৪% ভিডিওটি পুরো দেখেন। এখনকার মোবাইল ব্যবহারকারীদের সবচেয়ে সহজে দেখার জন্য তাই প্রায় সমস্ত সমাজ-মাধ্যমে উল্লম্বভাবে তৈরি ভার্টিকাল ভিডিও-র ছড়াছড়ি। এই ধরনের ভিডিও বিশ্বব্যাপী মোট ভিডিও, যা চালিয়ে দেখা হয়, তার প্রায় ৫৭% তৈরি করে, সেই একই ইনফোগ্রাফিক সমীক্ষা অনুযায়ী। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। ভার্টিক্যাল ভিডিওগুলি মানুষের, বিশেষত তরুণদের মনোযোগকে চুম্বকের মতোই টেনে রাখে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য যে 'জেড' প্রজন্ম ফেসবুক, টিকটক, বা ইনস্টাগ্রাম রিলস-এ ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রল করেছে, তাদের অবস্থা এরই সাক্ষ্য দিচ্ছে প্রতিদিন। ভার্টিকাল ভিডিওগুলোতে অনেক বিস্তারিত তথ্য ফ্রেমে দেখানো যায় না, তবুও এরা অপ্রয়োজনীয় পার্শ্ববর্তী বিবরণ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ১০ থেকে ৬০ সেকেন্ডের কেন্দ্রীয় অ্যাকশনে দর্শকদের পক্ষে ফোকাস করাটা অনেক সহজ করে তোলে। বলা বাহুল্য এটা আজকের দিনে বাজার তৈরি করার জন্য সাংঘাতিক উপযোগী, কারণ মানুষের মনঃসংযোগের দৈর্ঘ্য ও পরিসর কমেই চলেছে প্রতিদিন।

**রিল্‌স বা শর্টস বিনোদন ও বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে— একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু এই ধরনের বহু ভিডিওতেই আমরা যা দেখি, তা হল ব্যক্তিমানুষের প্রতিভা, শারীরিক সৌন্দর্য, বা দক্ষতার এক চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্স— যা এক মিনিটেরও কম সময়ে সেইসব মানুষের চূড়ান্ত অর্জনকে প্রদর্শন করে, কিন্তু সুকৌশলে আড়াল করে ফেলে সেই অর্জনে পৌঁছে যাওয়ার ক্লান্তিকর ও দীর্ঘমেয়াদি চেষ্টাগুলোকে।**

রিল্‌স বা শর্টসের নেশা এখনকার দিনে মাদকের থেকে কোনওমাত্রায় কম নয়। স্থায়ী চাকরির সাংঘাতিক অপ্রাচুর্য ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা, বিশেষ করে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আয়ের বিভিন্ন বিকল্প উৎস খোঁজার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে ব্যাপকভাবে। এর সঙ্গে রয়েছে বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার হাতছানি, অনেকের কাছে বাড়তি পাত্তা পাওয়ার জন্য আমাদের দুর্দমনীয় সহজাত আকাঙ্ক্ষা। মুঠোফোনের সাহায্যেই ভিডিও রেকর্ডিং করে তাকে দারুণ মুনশিয়ানার সঙ্গে সম্পাদনা করে নেওয়ার মতো প্রযুক্তি এসে গিয়েছে আমাদের হাতের মুঠোয়। এই সবকিছু মিলিয়ে, গত কয়েকটা বছরে ডিজিটাল কনটেন্টের জোগান বেড়েছে ধারণাতীতভাবে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তার উপভোক্তার সংখ্যাও। ফেসবুক বা ইন্সটাগ্রামের মতো সমাজ-মাধ্যমগুলো ইউটিউবের বিপ্রতীপ রাস্তায় হেঁটে, ৩-৪ মিনিটের ল্যান্ডস্কেপ ভিডিও-র বদলে ৩০-৪০ সেকেন্ডের ভার্টিকাল ভিডিও কনটেন্টের ওপর জোর দিয়েছে অনেক বেশি। কিন্তু আট-নয়ের দশকে যখন এইসব কিছুই ছিল না, তখন সবকিছুই কত ভাল ছিল, কলকাতা থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেত— এরকম অযৌক্তিক দাবির অবতারণা করার জন্য এই নিবন্ধ নয়। এর উদ্দেশ্য এই স্বল্পস্থায়ী কনটেন্টগুলোর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির মধ্যে যে বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে, অল্প পরিসরে তারও কিছুটা আলোচনা করা।

রিল্‌স বা শর্টস বিনোদন ও বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে— একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু এই ধরনের বহু ভিডিওতেই আমরা যা দেখি, তা হল ব্যক্তিমানুষের প্রতিভা, শারীরিক সৌন্দর্য, বা দক্ষতার এক চূড়ান্ত



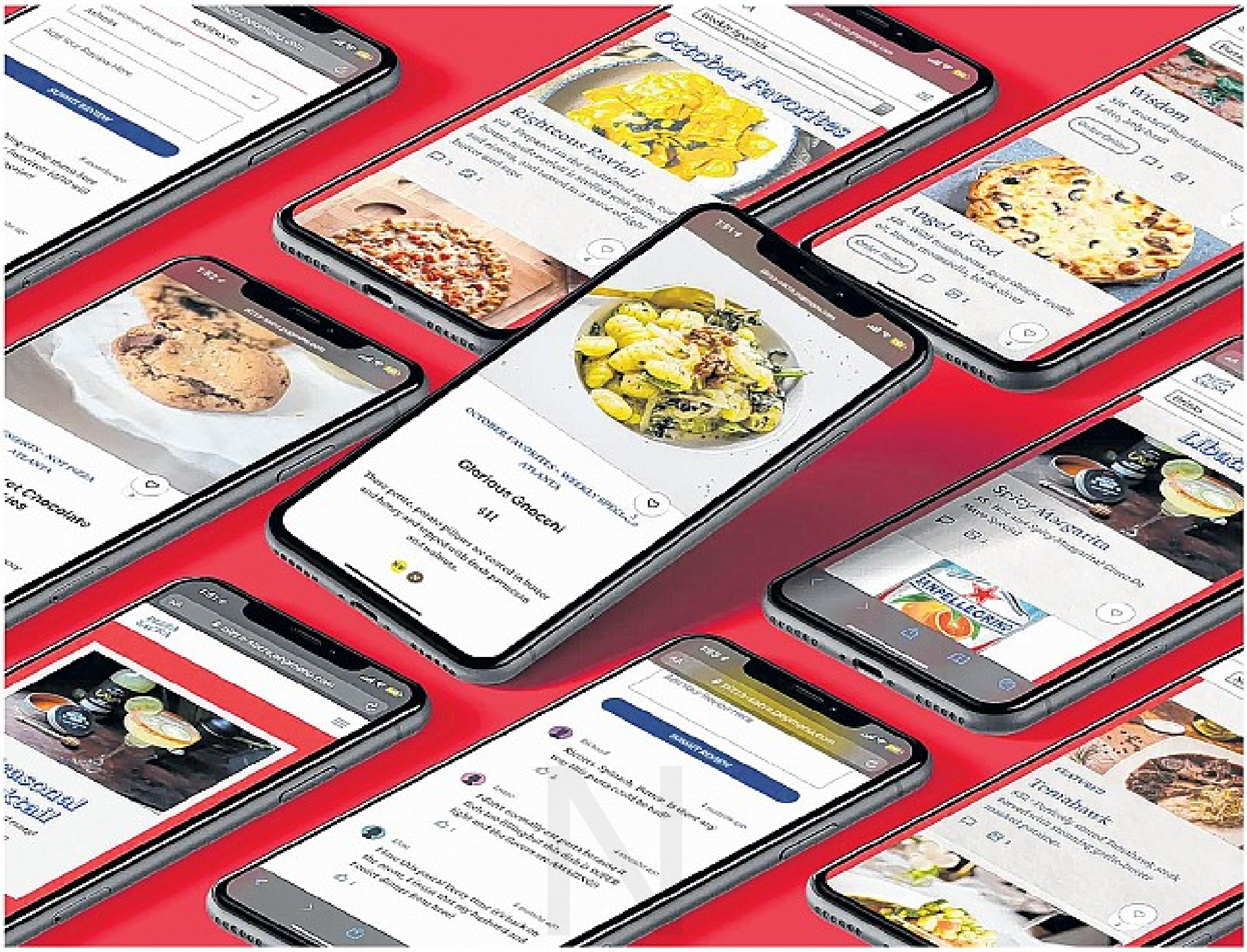
লোভে রিল, রিলে মৃত্যু! ১৬ বছরের ছেলেটির মর্মান্তিক এই পরিণতি ঘটেছিল হায়দরাবাদে

ক্লাইম্যাক্স— যা এক মিনিটেরও কম সময়ে সেইসব মানুষের চূড়ান্ত অর্জনকে প্রদর্শন করে, কিন্তু সুকৌশলে আড়াল করে ফেলে সেই অর্জনে পৌঁছে যাওয়ার ক্লান্তিকর ও দীর্ঘমেয়াদি চেষ্টাগুলোকে। এইসব 'হাইলাইট' রিলগুলো ক্রমাগত গিলতে থাকার ফলে সবসময় একটা ক্ষতিকর সামাজিক তুলনা করার প্রবণতা পেয়ে বসে আমাদের। হাসিখুশি, অল্পে তুষ্ট জীবনের সহজিয়া পথ থেকে সরে নিজের এবং অন্যদের প্রতি হয়ে উঠি জাজমেন্টাল। এইসব তুলনা তরুণ মনের আত্মবিশ্বাসকে ভাঙতে থাকে আর জন্ম দেয় তীব্র হীনমন্যতাবোধের। এই ধরনের বহু ভিডিও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নির্মাণ করে এক ধরনের কৃত্রিম শারীরিক আকর্ষণের, অবাস্তব সৌন্দর্যের মানদণ্ড। প্রতিদিন অজস্র 'নিখুঁত' মুখ, 'নিখুঁত' দেহ এবং সাজানো সৌন্দর্যের প্রদর্শনী দেখতে দেখতে নিজেদের সত্যিকারের অবয়বটার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠি আমরা, আর রাস্তা খুঁজি নিজেদের মতো রিলস ভিডিও বানিয়ে সমাজ-মাধ্যমে 'আমার মতন সুখী কে আছে' প্রমাণ করার জন্য। সুখী ও নিখুঁত জীবনের যে ঝলকগুলো দেখিয়ে যায় এইসব ভিডিও, সেগুলো অপরিণত মনের মাটিতে অঙ্কুরিত হতাশা, উদ্বেগ ও অবসাদের মতো ঋণাত্মক আবেগগুলোকে জল, হাওয়া দিয়ে পরিপুষ্ট করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। 'ফিয়ার অফ মিসিং আউট' বা 'ফোমো' শব্দটা আজকের এই 'জেড' প্রজন্মের কাছে বহুল-প্রচলিত। এ এমন এক উদ্বেগ, যার কবলে পড়ে কেউ ভাবতে থাকে, তাকে স্রেফ বাদ দিয়ে বাকি সব বন্ধুবান্ধব আনন্দ করছে, উল্লাসে মেতেছে গোটা দুনিয়াই। ফোমো মানুষকে আরও হতাশ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে কোনও কারণ ছাড়াই। আর রিল্‌স-এ ডুবে সাজানো সুখের ছবি দেখতে দেখতে ফোমো-য় আক্রান্ত হওয়াটা এখনকার তরুণ প্রজন্মের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হয়ে উঠেছে রীতিমতো ঘাতক এক প্রবণতা।

স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিও বাজারে এসেছিলই মানুষের মনোযোগের ঘাটতিকে পুঁজি করে। এখন এদের বন্যায় খড়কুটোর মতোই ভেসে যাচ্ছে বহু ছাত্রছাত্রী-র কোনও গভীরতর বিষয়ে একাগ্র পাঠের সক্ষমতা। 'ভাবা প্র্যাকটিস' করার বদলে ভাবনাচিন্তাকে এড়ানোর সহজ পথ হিসেবে এরা মগজে কারফিউ ঘোষণা করে অবসরের মুহূর্তগুলো কাটাচ্ছে রিল্‌স দেখে। এর ফলে বিকোচ্ছে পণ্য, সিনেমার প্রচার হচ্ছে, গান থেকে রাজনৈতিক বিদ্বেষ— প্রচার হচ্ছে সবকিছুর। কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণ ক্রমাগত শিথিল হচ্ছে দেখার মাত্রার ওপর। ক্লাস ফাইভ-সিক্স-এর কচিকাঁচাদের মোবাইল স্ক্রিনে নিছক নিরীহ কনটেন্টের ফাঁক গলে ঢুকে পড়ছে পর্নোগ্রাফি, এমনকী, অজাচার-কেন্দ্রিক ওয়েব-সিরিজের ক্লিপিং। শরীরের নিয়মে নিষিদ্ধের প্রতি সেই অমোঘ আকর্ষণ বাড়ছে আর বিভ্রান্ত শিশু পথ হারাচ্ছে আলোর ঝলকানি-ভরা এক মায়াজগতে।

তাই সবচেয়ে জরুরি বোধহয় ঠিক জায়গায় থামতে শেখা, বিরতি নেওয়া, ঠিক সময়ে। বিরতি নিন, এবং সুস্থতা বাড়ে এমন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করুন, যেমন হাঁটতে যাওয়া, বই পড়া, বা প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানো। স্ক্রিনটাইম সীমিত করুন। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের জন্য একটা দৈনিক সীমা নির্ধারণ করুন, যার মধ্যে রিল্‌স ভিডিও-ও অন্তর্ভুক্ত।

ডিজিটাল কনটেন্ট যাতে আপনার দিনের একটি বড় অংশ গ্রাস না করে তা খেয়াল রাখুন। স্ক্রিনটাইম ট্র্যাকিং অ্যাপ বা আপনার ডিভাইসের ফিচার ব্যবহার করুন যাতে নিজের নিয়ন্ত্রণ থেকে যায় আপনারই হাতে। আপনার সোশ্যাল মিডিয়া ফিড-কে করে তুলুন বৈচিত্র্যময়। এমন কনটেন্ট যুক্ত করুন, যা আপনার আগ্রহ, মূল্যবোধ এবং লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এমন অ্যাকাউন্টগুলি অনুসরণ করুন যা শরীর ও ভাবনার ইতিবাচকতা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সচেতনতা প্রচার করে। আর সবশেষে আসলে-নকলে ফারাক বুঝতে শিখুন ও শেখান, অল্পবয়সিদের বুঝতে শেখান যে, 'বিষ কী?' এই প্রশ্নটার যুগে যুগে একটাই উত্তর— 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছুই।'



# এটাসেটামিক্স

ইন্দ্রনাথ রুদ্র

**‘অ্যাসটেরিক্স’ কমিক বুক সিরিজের এই প্রবীণ পুরোহিত-কাম-বৈদ্যর অসাধারণ চরিত্রটি এটার সঙ্গে সেটা, ওটার সঙ্গে এটা এবং এটা-ওটা-সেটা মিশিয়ে নানা ধরনের জাদুকরি তরল ওষুধ তৈরি করত। এখনকার ফুড ভ্লগারদের অবস্থাও তেমন। পানপাতার বার্গার হয়েই গিয়েছে, কোনদিন হয়তো সুকুমার রায় কথিত ‘আমসত্ত্ব ভাজা’-ও হয়ে উঠবে অভিনব খাবার। খাদ্যরসিকতার নামে এ কি আদতে এক জাতীয় ‘ফুড পর্ন’-এর অশ্লীলতা নয়?**

চাকরির তখন প্রায় বছরখানেক বয়স। মাইনে বেড়েছে হাজার দুয়েক। সেই জোরে জীবনের প্রথম ‘উডল্যান্ড’-এর জুতোজোড়া কেনার সিদ্ধান্ত। এক বিকেলে আপিসের এক সহকর্মী-দাদা হলেন গাইড, দু’জন হাজির ধর্মতলার মোড়ে, ওবেরয় গ্র্যান্ডের ফুটপাথ-লাগোয়া নামীদামি সেই ব্র্যান্ডের শোরুমে। বেশ কয়েক ধরনের জুতো নাড়াচাড়া করে, পছন্দেরটি পায়ে গলিয়ে হাঁটাহাঁটি করে এবং সব শেষে সহকর্মী-গাইড দাদার গাইডেন্স মতো সাইজের পাদুকা কিনে হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ ঝুলিয়ে ডগমগিয়ে বেরলাম। মুখে গর্বের হাসি, হৃদয়ে তৃপ্তির আনন্দ।

কিন্তু সেসব বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল পরদিন দুপুরে আপিস বেরনোর মুখে নতুন জুতো পরতে গিয়ে। জুতো পায়ে ঢলঢল করছে। এক সাইজ বড়! সেই জুতো-কাহিনি শুনে আমার আর-একজন সহকর্মী দাদা অগ্নিশর্মা, ‘এত অপদার্থ তোমরা? আর যাকে নিয়ে গিয়েছিলে, তোমার ওই দাদাই তোমাকে এক সাইজ বড় জুতো কিনতে বলেছে। কী, ঠিক বলছি তো?’ কাঁচুমাচু মুখে নীরব আমার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়া দেখে দাদা আরও ক্রোধান্বিত, ‘তুমি কি এখন

বাড়ন্ত বাচ্চা যে, এক সাইজ বড় জুতো কিনবে? একটা কথা মাথায় রাখবে, সাইজে বড় মানেই সবসময় ভাল নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়।'

জুতোর তো তা-ও প্রাণ নেই। প্রাণ আছে, এমন কিছু বস্তুর ক্ষেত্রেও, এখন এই মধ্যবয়সে পৌঁছে, বেশ কিছু মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতার বৈতরণি পেরিয়ে বুঝি, বড় হলে প্রথমটায় চমক ও ঘোর লাগে ঠিকই— তবে শেষমেশ সবসময় কাজে তেমন আসে না। 'বড় বড়', 'বেশি বেশি' আসলে তত উৎকৃষ্ট নয় মোটেও। কিন্তু এখনকার অধিকাংশ ফুড ভ্লগার সেটা বুঝলে তো! যা বড়, যা বেশি, তারা মূলত তা নিয়েই আহ্লাদিত। স্বাভাবিকভাবেই তারা বিরিয়ানির ভাল-মন্দ বিচার করে, কতটা বড় মাংসের টুকরো তাতে পড়ছে, তা দিয়ে এবং কেবলই তা দিয়ে। বিরিয়ানির চালের স্বাদ কেমন, মাংসের জাত বা গুণমান কেমন, মাংসের পরতে পরতে ও প্রতিটি তন্তুতে বিবিধ মশলার প্রবেশ ঠিকঠাক হয়েছে কি না, সেসব দেখাদেখি বা মূল্যায়নের বালাই নেই। দেখতে হবে, ব্যাপারটা শুধুই 'বড়' কি না। মাংসের টুকরো কতটা বড়, তার নিক্তিতেই বিরিয়ানি নাকি বিচার্য। ওনলি সাইজ ম্যাটার্স!

বিরিয়ানির একটি ইটারি বা রেস্তোরাঁ চেনের মালিক এমন একটি ভ্লগে সগর্বে জানাচ্ছেন, আগে তাঁদের বিরিয়ানিতে মাংসের টুকরোর ওজন ছিল ২০০ গ্রাম, এবং সেটা এখন বাড়িয়ে করা হয়েছে ২২০ গ্রাম। নরম তুলতুলে মাংস নাকি খদ্দেরকে দিতে গিয়ে অনেক সময়েই ভেঙে যায় আর সেজন্যই মাংসের খণ্ড বৃহত্তর। হাঁড়ি থেকে বিরিয়ানি কেটে তোলার সময়ে কোনও কারণে মাংসের টুকরো ভেঙে গিয়ে সর্বাধিক ২০ গ্রাম বাদ পড়লেও, ২০০ গ্রাম থেকে বঞ্চিত হবেন না খদ্দের, সে-কথা ভেবেই এই বন্দোবস্ত। অন্তত সেই ইটারির মালিক যা বলছেন, যা বোঝাচ্ছেন। আর ফুড ভ্লগার কেবল তা নিয়েই বলে গেলেন, শুনিয়ে গেলেন, দেখিয়ে গেলেন। অর্থাৎ, তাঁরও ধারণা, মাংসের খণ্ড যত বেশি ওজনদার, বিরিয়ানি তত বেশি উৎকৃষ্ট।

ওস্তাদ রাঁধিয়ে এবং ভোজনরসিক মাত্রেই বোঝেন, বিরিয়ানির মাংস কেবল রেওয়াজি খাসি হলেই চলবে



না, তাকে হতে হবে শ্রেষ্ঠ জাতের মাংস। কিন্তু সেসব তো জানতে হবে! আর ভ্লগার তো সেসব জানেন না, জেনে নেওয়ার প্রয়োজনও মনে করেন না। অতএব, কিছু নিউজ চ্যানেলে যেমন সাংবাদিকতা ও সঞ্চালনার নামে কেবলই চিৎকার ও গলাবাজি এবং প্যানেল ডিসকাশনের নামে শুধুই হইহল্লা হয়, এসব তথাকথিত ফুড ভ্লগিং-ও কতকটা তেমন।

এককথায় বললে, কদর্য, কুৎসিত, কদাকার। বলিউডের একসময়কার হিন্দি ছবিতে একটা-না-একটা গানের সঙ্গে হিরোইন কিংবা ভ্যাম্পের নাভি বেআব্রু করে এবং অনেকটা ডিপ কাট চোলি বা কারুকার্যময় বক্ষবন্ধনি পরে নৃত্য পরিবেশন কম্পালসারি ছিল। ওখানেও সবকিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার উগ্রতা, তথাকথিত ফুড ভ্লগিংয়েও বড় সাইজে উৎকর্ষ পাওয়ার অশালীনতা। সূক্ষ্মতাকে মার গুলি!

সেজন্যই নদিয়ার একটি রেস্তোরাঁর মালিক আরও বেশ কয়েক কাঠি সরেস। তিনি চিলচিৎকার করে সদম্ভে ঘোষণা করেন, চারজনের প্লেটে ৫০০ গ্রাম এবং ছ'জনের প্লেটে ১২০০ গ্রাম 'মটনের রান'-এর খণ্ড দেওয়ার কথা। এবং এটা নাকি 'ভারতবর্ষে প্রথম'। বড় হাড়টা ধরে তুলে 'ঝাড়া দিলেই মাংস ঝরে ঝরে পড়বে'। ওখানেই ব্যাপারটা শেষ হচ্ছে না। বিরিয়ানির রাইস সেখানে আনলিমিটেড। সমস্যা হল, বিরিয়ানির রাইস কেন-ই বা আনলিমিটেড হতে যাবে? ডাল-ভাজা, তরিতরকারি, মাছের কালিয়া, মাংসের ঝোলের সঙ্গে বিড়াল ডিঙতে পারবে না, এমন স্তূপীকৃত ভাত এখনও অনেকে খেতে পারেন। তা' বলে তাঁরা কখনও বিরিয়ানি অতটা খান না। বিরিয়ানির চাল, মাংস সবকিছুর তো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। ১২০০ গ্রাম মাংসের টুকরো থেকে কেটে কেটে যখন ছ'জনকে দেওয়া হচ্ছে, তখন মাংসের প্রতিটা টুকরো ২০০ গ্রামের রাখলেই হয়! তাতে মশলা ভালভাবে ঢুকে ব্যাপারটা আরও সুস্বাদু করে তুলবে।

ভ্লগারদের কেউ-কেউ মাংস দাঁতে কাটার পর চোখ নাচিয়ে, মুখ নাড়িয়ে বলছেন, 'খুব সফ্‌ট, খুব।' কিন্তু সফ্‌ট মানেই কি সুস্বাদু? অত বড় রান বিরিয়ানিতে দিলে পরিপক্ব হতে পারবে? হওয়া সম্ভব? বিশাল বড় এক মাংসের টুকরোর এই দানবিকতার প্রদর্শন আসলে রুচিহীনতা। এবং এটা কি বিরিয়ানি? চাল ও মাংস এবং আলু যখন বিভিন্ন মশলার সঙ্গে দমে দিয়ে পাকানো হচ্ছে, তখন তো বিরিয়ানি না-বলে উপায়ও নেই। বিরিয়ানি অবশ্যই। তবে ঘটোৎকচীয় বিরিয়ানি।

গল্পটা কিন্তু এখানেও শেষ হচ্ছে না।

সার্ভ করার সময় বিরিয়ানির মাংসের ওপর প্রায় ৫০ গ্রাম মাখনের টুকরো! সেটাও দেখিয়ে দাপটের সঙ্গে বলা হচ্ছে, 'রাম পাঞ্চ' নামে একটা মারকাটারি ককটেলে অ্যালকোহলিক পানীয় বলতে রাম। সেখানে পড়বে মিষ্টি রসসমেত ক্যানবন্দি ফল, জল, বিভিন্ন ধরনের হালকা পানীয় বা সফ্‌ট ড্রিঙ্ক এবং প্যাকেটবন্দি ফলের রস। এসব উপকরণ যত বেশি ঢালতে পারা যাবে, রাম পাঞ্চ হবে ততই সমৃদ্ধ। তা, বিরিয়ানি কি রাম পাঞ্চ নাকি, সেখানে স্নেহজাতীয় পদার্থ যত বেশি ঢালা হবে, ততই তার স্বাদ খোলতাই হবে! বিরিয়ানির মাংসের ওপর যদি মাখন দেওয়া যায়, তাহলে ভাবছি, বিরিয়ানিতে একদিন টোম্যাটো কেচাপ ঢেলে খেয়ে দেখব। কিংবা আলুপোস্ত দিয়ে সাপটে মাখব বিরিয়ানি। ফিশ কবিরাজি-কাটলেট কড়াই থেকে প্লেটে নামার পর তার ওপরেও ছড়ানো হচ্ছে মাখন! আরে, ওতে তো কবরেজির নিজস্ব, জিভে জল আনা গন্ধের হানি ঘটবে!

কে বোঝে সে সব!

এ যা চলছে, তাতে 'অ্যাস্টেরিক্স' কমিক বুক সিরিজের সেই প্রবীণ পুরোহিত-কাম-বৈদ্যর অসাধারণ চরিত্রটিও মনে হয় ফেল করে যাবে। ফরাসিতে যার নাম ছিল 'প্যানোরামিক্স', ইংরেজিতে 'গেটাফিক্স'। আর ফরাসি থেকে সরাসরি বাংলা অনুবাদে সেই বৃদ্ধের নামকরণ হয়েছিল— এটাসেটামিক্স। কারণ, এটার সঙ্গে সেটা, ওটার সঙ্গে এটা এবং এটা-ওটা-সেটা মিশিয়ে তিনি নানা ধরনের জাদুকরি তরল ওষুধ তৈরি করে। তবে পানপাতার বার্গার তৈরির কথা সম্ভবত এটাসেটামিক্সের মাথাতেও আসত না!

**বিরিয়ানির মাংসের ওপর যদি মাখন দেওয়া যায়, তাহলে ভাবছি, বিরিয়ানিতে একদিন টোম্যাটো কেচাপ ঢেলে খেয়ে দেখব। কিংবা আলুপোস্ত দিয়ে সাপটে মাখব বিরিয়ানি। ফিশ কবিরাজি-কাটলেট কড়াই থেকে প্লেটে নামার পর তার ওপরেও ছড়ানো হচ্ছে মাখন! আরে, ওতে তো কবরেজির নিজস্ব, জিভে জল আনা গন্ধের হানি ঘটবে!**

হ্যাঁ, পানপাতার বার্গার! সেটাও এখন ওই তথাকথিত ফুড ভ্লগারদের দৌলতে 'ভাইরাল'। গত বছর এই কিম্ভূতকিমাকার বস্তুটির কথা নেটদুনিয়ায় ছড়ায়। যার উৎপত্তি মুম্বইয়ে। দু'-ভাগ করা বার্গার বানের মধ্যে দেওয়া পানপাতার ওপর চকোলেট, বাদাম, মিছরি, গুলকন্দ এবং মেয়োনিজ! আমার তারপর থেকে বার্গার এবং পান— দুটোর কথা ভাবলেই গা গুলিয়ে উঠছে! সুকুমার রায়ের 'বোম্বাগড়ের রাজা' কবিতা আজও ভীষণ রকমের প্রাসঙ্গিক। তবে বাজি ফেলে বলতে পারি, এখন সুকুমার রায় ওই কবিতা লিখলে 'ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা' নিশ্চয়ই লিখতেন না। কারণ, কে বলতে পারে, দু'দিন পর আমসত্ত্ব ভাজাকেই খাবারের দুনিয়ায় ব্যতিক্রমী এবং অভিনব বলে চালানো হবে না! ঝুঁকি এবং ভয় থাকছে ইলিশ মাছের চমচম, গলদা চিংড়ির রসমালাই (মালাইকারি হলে রসমালাই নয় কেন? এমন প্রশ্ন ওই ভ্লগারদের থেকে উঠলে আশ্চর্য হবেন না) কিংবা মুরগির নিখুঁতি তৈরি হয়ে যাওয়ারও।

রসিকতা নয় মোটেও! অভিনবত্ব আর ফাজলামির তফাত কোথায়, সেটা না-বুঝাতে পারলে কিংবা বুঝেও না-বুঝলে এরকমই চলবে।

ডেকার্স লেনের এক ইটারির মালিক এখন ভ্লগারদের অনেকের খুব প্রিয় দাদা। সেই দাদার পালক পনির দেখাতে গেলে তিনি বারবার বলেন, "এটা কিন্তু 'পালক পনির' নয়, এটা পালক কর্ন পনির। অন্যদের মতো আমার এখানে শুধু 'পালক পনির' পাওয়া যায় না।" অর্থাৎ, তিনি এটাই বোঝাতে চান, 'পালক পনির'-এ ভুট্টার দানা দিয়ে তিনি ধন্য করছেন। কিন্তু তাঁর এবং সেসব ভ্লগারের এই বোধটুকুও নেই যে, 'পালক পনির' এক মোলায়েম আইটেম। যা জিভে খেলবে এবং গলা দিয়ে নামবে মসৃণভাবে। যাতে কোনও বাধাবিঘ্ন থাকবে না। অথচ 'পালক পনির'-এ কর্ন দিলে তাতে যুক্ত হয় হোঁচট। ভুট্টার দানা মুখে পড়লে তা চিবনোর পরিশ্রম ও ঝঞ্ঝাট আছে বইকি!




যাদের দাঁত মজবুত, তাদেরও অনেকে এই ঝক্কি নিতে না-চাইতেই পারে। আবার সেই দাদা যখন পনির ভর্তা গোছের কোনও প্রিপারেশনে কাজুবাদাম ঢালছেন, তখন কোনও কোনও ভ্লগারের প্রশ্ন, 'দাদা, এটা কি কাজুবাদাম?' ওই দাদা তখন গরম নেন, 'আমি কী জানি, কাজু না কী?' একজন ফুড ভ্লগার কাজুবাদাম চিনবে না? না কি ওটা স্রেফ ন্যাকামি?

এই ভ্লগার কুলের বিবেচনাবোধ বলতে প্রায় কিছুই নেই। সব ধরনের আধিক্য ও আদিখ্যেতায় তাদের আনন্দ, সুখ, মোক্ষ। সংখ্যায় বেশি হতে হবে, আয়তনে বেশি, পরিমাণে বেশি, ওজনে বেশি। এবং এসব 'বেশি' দেখাতে-দেখাতে চিৎকারও বেশি। একটা ১৫০ টাকার থালিতে চিকেন, মাটন-সহ ১০ রকমের আইটেম। আরেব্বাস, কী দারুণ! খেতে কেমন সেসব? তার কোনও পর্যালোচনা নেই, বিশ্লেষণ নেই, বিচার নেই। কেবলই হইহই আর চিৎকৃত বাড়াবাড়ি আছে। একটি ফিশ কবিরাজি ১৭ ইঞ্চি লম্বা, কেবল সেজন্যই নাকি উচ্চাঙ্গের। ম্যারিনেশনটা কেমন তাতে, ডিমের কভারেজে মুখ মেরে যাচ্ছে কি না, ভেটকির স্বাদ ওই কভারেজে ঢেকে যাচ্ছে কি না— জানানোর কোনও দরকার নেই। তবে নিজে বুঝলে তবেই তো অন্যকে বা অন্যদের জানানোর প্রশ্ন। তা-ই না? মুরগির বড়-বড় টুকরো, ইয়া মোটা টেংরি। অসাধারণ। তার মানে বেশি ওজনের ব্রয়লার। তাতে স্বাদ হয়? সেটাও আবার মুরগির নখসমেত। দেখেই কি বিবমিষা জাগে না?

কোনও ইটারি বা রেস্তোরাঁ একহাঁড়ি বিরিয়ানি নামানোর পর তাতে এক কেজি ঘিয়ের ছড়া দিত, এখন দিচ্ছে দেড় কেজি। আহা, কী অপূর্ব! কিন্তু তাতে কি ওই বিরিয়ানির স্বাদ বাড়বে? তার চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন, ওই খয়েরি রংয়ের আধা তরল কি আদৌ ঘি? না কি পশুর চর্বি, বনস্পতি রাসায়নিক, রং এবং গাওয়া এসেন্স দিয়ে তৈরি এক বিপজ্জনক বস্তু?

কোনও ভ্লগে একটি বাজারে ১১ কেজির ভেটকি কাটা দেখানো হচ্ছে, তো অন্য ভ্লগে কোনও রেস্তোরাঁর হেঁশেলে মালিকের ২৫ কেজির ভেটকি হাতে তুলে ধরে চিৎকার করে নাচানাচির ভিডিও। অত বেশি ওজনের ভেটকিতে ফ্রাই, ওরলি, ম্যনিয়ের-এর (যাকে ভুল করে বলা হয় 'মুনিয়ে' কিংবা 'মুনিয়া') মতো প্রিপারেশন করতে গেলে আইটেমটা যে বেঁকে যাবে, সেটা কিন্তু এই ভ্লগারদের জানা নেই। বিপুল ওই দেশি ভেটকি নিঃসন্দেহে সুস্বাদু, তবে তা সবচেয়ে ভাল যাবে ফিশ তন্দুরি বা ফিশ টিক্কায়। কিন্তু কে সেসব জানিবার বেদনা নেবে? সব কেবল বড় হতে হবে।

সুস্বাদু খাবারের সুগন্ধ নিলে অর্ধেক ভোজন হয়ে যায়, এমনটা কথিত আছে। সেটা প্রাক্-ইন্টারনেট যুগ, সমাজমাধ্যমের কথা। এখন ফেসবুকে পাওয়া, হোয়াটসঅ্যাপে আসা বহু ফুড ভ্লগারের ভিডিও দেখেও অর্ধেক ভোজন হয়ে যাচ্ছে আমাদের অনেকেরই। কিন্তু কী সেই ভোজন? কুশ্রী ও রুচিহীনভাবে প্রদর্শিত খাবার মনে মনে খেয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে আমরা গিলছি অশ্লীলতা। এ-ও এক অন্য ধরনের ফুড পর্ন, যা শব্দবন্ধের তথাকথিত অর্থকে হাটে বেচে দিচ্ছে রোজ। তারিয়ে তারিয়ে, চেটে চেটে যা খাচ্ছি পরমানন্দে!

জয় হোক এই ভ্লগারদের এবং তাদের দর্শককুলের, কিন্তু চেতনা হবে কি?



# কলকেতায় কালো সাহেব

ঈপ্সিতা হালদার

**সতেরো শতক। ধীরে-ধীরে কলকাতার বিস্তার হচ্ছে জঙ্গল সাফ করে। কলকাতা গড়ে উঠছে 'সিটি অফ প্যালেস' হয়ে, আর সেই সিটিতে হোয়াইট টাউনের সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। এমন সময়, জুলিয়াস সউবিস উদিত হলেন এই ইউরোপীয় এলাকায় দারুণ এক ফেন্সিং-লড়িয়ে, চ্যাম্পিয়ন ঘোড়াবাজ ও মিউজিশিয়ান হিসেবে।**

'আ মানগো ম্যাকারোনি': জুলিয়াস সউবিসের কার্টুন, এচিং (১৭৭২)



ডাচেস ক্যাথরিনের সঙ্গে সউবিসের ডুয়েল, প্রতীকী কার্টুন, এচিং (১৭৭৩)

পর্ব ১০

স্ট্র্যান্ড রোড ধরে রবীন্দ্র সদনের দিকে আসতে গেলে সিগনালে থামলেই অবধারিত একটা গন্ধ পাওয়া যায়। বাঁদিক থেকে ভেসে আসে। গন্ধের সুলুক দিয়ে যদি কলকাতার একটা ম্যাপ বানাতে চাই, আপনাকে চোখ বেঁধে সেই ম্যাপের এই পয়েন্টে আনলেই আপনি অবধারিত ফুকরে উঠবেন, এই তো রেস কোর্সের পাশে এসে পড়েছি। এই তো ঘোড়ার আস্তাবল। 'ক্যালকাটা রয়্যাল টার্ফ ক্লাব' নিয়ে আমার জ্ঞান হল, সিনেমার পর্দায় বাইনোকুলার হাতে ভেসে ওঠা বিদেশি রোদচশমা চোখে মহতীরা। কারও-কারও আবার ভিনটেজ কার। কাজেই রেস কোর্স এই কলাম থেকে প্রথমেই বাদ। সেই হেঁটে দেখতে শেখার জন্য শিব্রামের কাঞ্চন বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় এলে তার সঙ্গে রেসে বাজি রাখা এক কাতরা ব্যক্তির চেনাজানা হয়। কিন্তু এই ক্লু ধরে 'রেসের মাঠে সাব-অলটার্ন' শিরোনামে কিস্তি ঠিক কতখানি সমীচীন হবে ভাবি। আর কে জানে, ঝোঁকের মাথায় কাদের ফলো করে কোন শেডি জায়গায় উপনীত হব। বরং, যারা ঘোড়ার দেখভাল করে বা রয়্যাল মাঠের ঘেসেড়া, তাদের সঙ্গে আলাপ করলে আখেরে কাজে দিতে পারে। 'ঘেসেড়া' বললাম বলে আবার রে-রে করে উঠবেন না। জাতকের অনুবাদে ঈশানচন্দ্র ঘোষ থেকে উৎপলকুমার বসুও ঘেসেড়া লিখেছেন। জাতকের গল্পে, এই ঘেসেড়াদের মাঠে পৌঁছনোর আগেই সেখানের ঘাস কেটে নিয়ে আবার তাদের কাছেই বিক্রি করেছিলেন বোধিসত্ত্ব।

যাই হোক, ক'দিন ধরে মেন ফটকের কাছে ঘুরঘুর করতে থাকি। কিন্তু এ তো চটকলের বাঁশির ব্যাপার নয়। তাই খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারি না। এদিকে, কিস্তির লেখা জমা দেওয়ার দিন ঘনিয়ে আসে। টেনশনে প্রায় মাউন্ট পুলিশের উঁচু

ঘোড়ার নীচে চাপা পড়তে বসি।

কোনওক্রমে রিফ্লেক্সে ফুটপাতে ঝাঁপিয়ে ফিরেই বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে আসে এদের আস্তাবল খুঁজে পেলেও তো কিছু গল্প জানা যাবে নিশ্চিত, কিন্তু সম্বিত ফিরে জিজ্ঞেস করতে-না-করতে রণপায়ের গতিতে তিনটি ঘোড়ায় চাপা গম্ভীর পুলিশ দ্রুত রেড রোড পেরিয়ে গঙ্গার দিকে চলে যায়। আমি ভীষণ উদ্বিগ্নভাবে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-র সামনে দিয়ে পার্ক স্ট্রিট ধরে এগই। কফি না-খেলে আর 'চাঙ্গা সি' লাগছে না।

কিন্তু কেন আজ আমার ব্যাগে ময়ূখ চৌধুরীর কমিক্সে রবিনহুড? একটা পুরনো কলকাতার ওপর বই থাকলেও না হয় একটা না-জানা রাস্তার নাম থেকে কিছু আইডিয়া ক্লিক করে যেত! প্রাণপ্রিয় ময়ূখ চৌধুরীর বই খুলে বিরসবদনে চেয়ে থাকি। রবিনহুড নেমে আসছে দুর্গের প্রাকার থেকে, হাতে তলোয়ার। সরু ফিনফিনে তার ব্লেড। হয়তো উনি হলিউডের সিনেমা দেখে এসব ফেন্সিং ডুয়েল অ্যাকশন সিন এঁকেছিলেন। তারপর রবিনহুড লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠল। বেরিয়ে যাচ্ছে ঘোড়া ছুটিয়ে হাতে খোলা তলোয়ার। একেই তো 'ফেন্সিং' বলে। আমার মাথায় বাল্‌ব জ্বলে ওঠে।

জুলিয়াস সউবিস (১৭৫৬-১৭৯৮)! কলকাতায় আগত প্রথম অ্যাফ্রিকি-ব্রিটিশ। ইউরোপে, বিশেষত ব্রিটেন বা ফ্রান্সে উঠতি যুবারা কাপ্তেনি করতে গিয়ে সামলাতে না-পারলে তাদের বিনা বাক্যব্যয়ে চালান করে দেওয়া হত কলকেতায়। তাতে কেচ্ছাকাহিনিও ধামাচাপা দেওয়া যেত, আর বাড়ির ও পাড়ার লোকেদের আশা হত যে, কলকাতায় মশা-মাছি প্যাচপেচে গরম পিলেজ্বর-কালাজ্বর আদি সামলাতে গিয়ে এক্সট্রা ডানা কাটা পড়বে, আর কে বলতে পারে নতুন শহরে উড়তে থাকা টাকাও এরা যদি কিছু সাপটে নিতে পারে। জুলিয়াস সউবিস ওই গোত্রের। তিনি ছিলেন লন্ডনের দাপুটে ফেন্সিং মাস্টার, ইতালীয় দমিনিক অ্যাঞ্জেলোর প্রিয় ছাত্র। কলকাতায় নানা দেশ থেকে আসা কোম্পানির সাহেবদের ট্রেনিংয়ের জন্য সউবিস খুলে বসেন কলকাতার প্রথম ফেন্সিং স্কুল। আর হর্স রাইডিং স্কুল। এরই সঙ্গে শুরু করেন ঘোড়ার ব্যবসা। আর ওই যে চাঁদনি চক বাজার, তার পিছনেই তো ওঁর ঘোড়ার বিরাট আস্তাবল ছিল। সেই রমরমে আড়ত থেকেই বিক্রি হত নানা উচ্চমানের স্ট্যালিয়ন।

সউবিসের প্যাটার্নের এরকম অনেক কাপ্তেনই তখন কলকাতার সাহেবি পাড়া সরগরম করে রেখেছিল। ১৯ শতকের প্রায় মাঝামাঝি অবধি কলকাতা ছিল ইউরোপের চরিত্র খোয়ানো নব্য যুবাদের রিহ্যাব সেন্টার। বয়স বছর ২০ হতে-না-হতে বোদলেয়র নানা নিষিদ্ধপল্লি ঘুরে এমন সিফিলিস ইত্যাকার রোগ বাধিয়ে ফেলেছিলেন আর দু'-হাতে টাকা উড়িয়ে বাজারে এমন ধারদেনা করে ফেলেছিলেন যে, বোদলেয়রের ক্রুদ্ধ সৎ বাবা তাঁকে সোজা চাপিয়ে দেন কলকাতাগামী জাহাজে। বোদলেয়র নিশ্চয়ই কলকাতা সম্পর্কে 'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ' গোছের স্বপ্ন নিয়ে জাহাজে উঠেছিলেন, যেজন্য মাঝপথে কোনও একটা বন্দর থেকে প্যারিসে ফিরে গেলেও, বেশ রং চড়িয়ে 'হাতির পিঠে চেপে' নামে প্রাচ্যে নিজের ভ্রমণ-বিষয়ক প্রায় একটা কিংবদন্তি রচনা করে ফেলেন।

আমাদের জুলিয়াস সউবিস জন্মেছিলেন ক্যারিবীয় কিট্‌স দ্বীপে। তাঁর মা ছিলেন জামাইকা-র। ক্রীতদাস। সউবিসের যখন বছর দশেক বয়স, তাঁকে ওথেলো নাম দিয়ে দাস হিসেবে নিয়ে আসা হয় ইংল্যান্ড। পাঠানো হয় 'ডাচেস অফ কুইন্সবেরি'-র কাছে। ডাচেস অফ কুইন্সবেরি ক্যাথরিন ডগলাস ছিলেন লন্ডনের এক মক্ষীরানি। ব্রিটেনের নানা নামজাদা লেখক, কবি, নাট্যকার তাঁর আশপাশে পাক খেয়ে ঘুরত। আমাদের সউবিসকে দাস অবস্থা থেকে মুক্ত করে তাঁকে 'প্রিন্স অফ সউবিস' নামে এক ফরাসি ডিউকের নামে নাম দিয়ে প্রায় নিজের ছেলের মতোই আহ্লাদ দিয়ে বসেন ক্যাথরিন। তাতে যতটুকু ব্যাদড়া হয়ে ওঠার ছিল, সউবিস তার হদ্দমুদ্দ করেন। একে তো দমিনিক অ্যাঞ্জেলোর কাছে ফেন্সিং আর ডেভিড গ্যারিকের কাছে গান, পিয়ানো বাজানো আর অভিনয়ে তালিম নিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন এক অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্ব। সেই সঙ্গে পোশাকআশাকের আড়ম্বরে ফ্যাশনিস্তা, এলিট সমাজের সূক্ষ্ম কেতাবাজ সউবিস ডান হাতে বাঁ-হাতে নাড়ি ফুসলিয়ে হয়ে ওঠেন এক পাক্কা রসরাজ। আসলে তিনি আফ্রিকার এক রাজার ছেলে, ব্ল্যাক প্রিন্স— ১৯ বছরে পা দিয়ে এই গপ্প ব্রিটেনের অভিজাত সমাজে খাইয়ে দিয়ে সউবিস হয়ে পড়েন এক হাতেগরম এগজটিকা। তাঁর নানা কীর্তিকলাপ নিয়ে নানা গসিপ ও কার্টুনে লন্ডনের পত্রপত্রিকা ছেয়ে যেতে থাকে।

**এমনিতেই ব্রিটেনে ফুলবাবুদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হত 'ম্যাকারোনি' নামে ডেকে। ১৭৭১ থেকে ১৭৭৩-এর মধ্যে ম্যাথিউ আর মেরি ডারলি এই ম্যাকারোনিদের নিয়ে প্রায় ৪৫০ খানা কার্টুন ছাপান। সউবিসকে নিয়ে কার্টুন ছাপা হয় 'এ মানগো ম্যাকারোনি' নামে। ওই সময়ের হিট 'দ্য প্যাডলক' অপেরায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক কালো ক্রীতদাসের সুপারহিট রঙ্গব্যঙ্গ চরিত্রের নামে সউবিসের এই 'মানগো' অভিধা জোটে।**

শুধু সউবিস-ই নয়, ১৮-১৯ শতকে আফ্রিকা ক্যারিবিয়ান থেকে যেসব কালো মানুষ দাস হিসেবে ব্রিটেনের অভিজাত সমাজে এসে পড়েছিল, কালক্রমে তাদের কেউ কেউ সউবিসের মতো পৃষ্ঠপোষক পেয়ে নাচগান-ঘোড়দৌড়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়, বাবু সমাজে ওঠবস করে 'কালো সাহেব' হয়ে কেতার জীবন কাটায়। এমনিতেই ব্রিটেনে ফুলবাবুদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হত 'ম্যাকারোনি' নামে ডেকে। ১৭৭১ থেকে ১৭৭৩-এর মধ্যে ম্যাথিউ আর মেরি ডারলি এই ম্যাকারোনিদের নিয়ে প্রায় ৪৫০ খানা কার্টুন ছাপান। সউবিসকে নিয়ে কার্টুন ছাপা হয় 'এ মানগো ম্যাকারোনি' নামে। ওই সময়ের হিট 'দ্য প্যাডলক' অপেরায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের এক কালো ক্রীতদাসের সুপারহিট রঙ্গব্যঙ্গ চরিত্রের নামে সউবিসের এই 'মানগো' অভিধা জোটে।

কে জানে, ডাচেস ক্যাথরিন তাঁর দুই ছেলে মারা যাওয়ার পর সউবিসের মধ্যে কোনও প্রতিষেধক খুঁজছিলেন কি না। কে জানে, তিনি সউবিসকে নিজের পোষ্য ব্ল্যাক প্রিন্স ভাবতেন কি না। লন্ডন শহরে সউবিসের জন্য নিজস্ব আলাদা বাড়ি ছিল। সে যাই হোক, ক্যাথরিনের সঙ্গে সউবিসের সম্পর্কের আবছায়া নিয়ে লোকে কি আর গসিপ করা ছেড়ে দিয়েছিল? সেই কার্টুনও লোকে রসিয়ে রসিয়ে দেখেছে। সউবিস বেছে বেছে ইটন কলেজ আর অ্যাঞ্জেলোর

অ্যাকাডেমির অভিজাত ছাত্রদের সঙ্গে ওঠবস করতেন আর ডুয়েল লড়তেন। দমিনিক অ্যাঞ্জেলোর ছেলে হেনরি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, অ্যাকাডেমিতে জুলিয়াসের আলাদা ঘর ছিল। তাতে দোস্তদের ভিড় লেগেই থাকত। বসন্তকালে সেই ঘর নাকি তিনি ভরিয়ে ফেলতেন গোলাপ, জিরেনিয়াম ও ইত্যাকার দামি হাউস প্ল্যান্টে। সুগন্ধি নিয়ে তাঁর নাকি এমন বাড়াবাড়ি ছিল যে, তিনি হেঁটে গেলেই লোকে শ্বাস নিয়ে বলে দিত, ওই যায় সউবিস। তিনি যখন কেতাদুরস্ত ইউনিফর্ম পরা চাকরবাকরে পরিবৃত হয়ে দুর্মূল্য ডুন ঘোড়ায় টানা জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে যেতেন, লোকে চমকে যেত। এসবের সঙ্গে ফাউ হিসেবেই নানা অকথ্য কীর্তিকলাপ ঘটিয়ে (তার মধ্যে রেপ চার্জও ছিল) ১৭৭৭-এ সউবিস কলকাতার উদ্দেশে চম্পট দেন। দমিনিক অ্যাঞ্জেলোই ক্যাথরিনকে এই বুদ্ধি বাতলান। যদিও ঘোটালা স্তিমিত হতে সময় লাগে।

বছর দুয়েক পরে নৈশ লন্ডনপুরীর হাই-এন্ড ব্রথেলের খানিক কল্পিত খানিক সত্যি রগরগে সেমি-পর্নোগ্রাফিক বিবরণ সমৃদ্ধ 'Nocturnal Revels' বইটা বেরলে দেখা যায়, প্রথম দু'খানা চ্যাপ্টারই সউবিসের রাত্রিকালীন অভিযানে ঠাসা। বলা বাহুল্য, কালো মানুষ হিসেবে সউবিসের এই লাগামছাড়া সাবভারসন বিলিতি সমাজে যারপরনাই অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। অন্য সব পত্রিকার মতোই 'Nocturnal Revels'-ও কালো ও দাস হিসেবে জুলিয়াসের প্রকৃত জায়গা কী, তা বুঝিয়ে দিতে কসুর করেনি।

১৭৭৭-এর জুলাই মাসে বেরিয়ে জুলিয়াস সউবিসের জাহাজ পরের বছর মাদ্রাজে এসে থামে। তিন সপ্তাহ ধরে আবার জাহাজে চলে মার্চ মাসের দিকে এসে জুলিয়াস নামেন চাঁদপাল ঘাটে। এটাই তখন ছিল কলকাতায় বড় জাহাজ ভিড়ানোর ঘাট। সউবিস তখন ২৩। যাবতীয় অঘটন সামলে দেওয়ার জন্য, বা অকাতরে টাকা ঢালার জন্য আর হাতের নাগালে ক্যাথরিন নেই।

তখন কলকাতা সবে তৈরি হচ্ছে! থাকার মধ্যে আছে কোর্ট হাউস আর অনাথ সাহেব বাচ্চাদের জন্য চ্যারিটি স্কুল। এই চ্যারিটি স্কুল-ই পরে ফ্রি স্কুল হবে, যার নামে রাস্তা হবে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ও আরও পরে নাম নেবে মির্জা গালিব স্ট্রিট। তখনও কোনও চার্চ তৈরি হয়নি, ফোর্ট উইলিয়ামের গায়ে অন্ধকূপের পাশে একটা বাড়িতে মাস হত। অবশ্য আমাদের সউবিসের চার্চের খুব একটা দরকার ছিল বলে মনে হয় না। আর চার্চ না থাকলেও ততক্ষণে কলকাতায় চালু হয়ে গিয়েছে থিয়েটার হল, বল নাচের আসর, বাইজি মজলিস, পানশালা। ফলে ইউরোপীয়, ইউরেশীয় আর কিছু আর্মেনিয়ানের আমোদের জায়গার অভাব হয়নি। আমাদের সউবিস নিজ মনপসন্দ মহল্লা পেয়ে যান। তখন ধীরে-ধীরে কলকাতার বিস্তার হচ্ছে জঙ্গল সাফ করে। কলকাতা গড়ে উঠছে 'সিটি অফ প্যালেস' হয়ে, আর সেই সিটিতে হোয়াইট টাউনের সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। সউবিস উদয় হন এই ইউরোপীয় এলাকায় দারুণ এক ফেন্সিং-লড়িয়ে, চ্যাম্পিয়ন ঘোড়াবাজ ও মিউজিশিয়ান হিসেবে।


আফ্রিকার প্রিন্স জুলিয়াস সউবিস, 'Reminiscences of Henry Angelo' বই থেকে (১৮৩০)

১৭৮০-তে সউবিস ফেন্সিং শেখানো শুরু করেন, সোম-বুধ-শুক্র। তারপর বৃহস্পতিবারটায় তিনি খুলে বসতে চান ঘোড়া চড়া শেখানোর ট্রেনিং স্কুল। সেই স্কুল তৈরির জন্য টাকা তুলতে থিয়েটার হলে সউবিস মঞ্চস্থ করেন 'ওথেলো', নিজে নামভূমিকায়। অভিনয় শেষে একটা তামাশার অংশ থাকে, যেখানে তিনি মানগোর ক্যারিকেচার করে দর্শকের মন জয় করে নেন। লালবাজার পুলিশ কোর্টের উল্টোদিকে হারমোনিকা বারের পিছনের বাড়িতে ১৭৮৪-তে সউবিস খোলেন ফেন্সিং স্কুল। ফেন্সিং স্কুলে ভর্তি হতে দুই গিনি লাগত, মাস প্রতি দক্ষিণা আরও দুই গিনি। প্রাইভেটে শিখতে তিন-তিন। সউবিসের ফেন্সিং স্কুল সাহেবসুবোদের মধ্যে এমন ধুন্ধুমার ঘটিয়ে দেয় যে, লেখা হয় লন্ডনের সোহোতে দমিনিক অ্যাঞ্জেলোর অ্যাকাডেমিতে যেমন একটা বিশেষ অভিজাত মক্কেলরাই যায়, সউবিসের ফেন্সিং স্কুলও কলকাতার সেরকম অভিজাতদেরই আখড়া। মাঝে-মাঝেই রাইডিং অ্যাকাডেমির ছাত্ররা নিমন্ত্রিত জমায়েতে নিজেদের ট্রেনিং জাহির করত। আর এটা শুধু রাইডিং স্কুলই ছিল না। সউবিস সেখানে ব্রিটেন আয়ারল্যান্ডের টাউন মফস্‌সল থেকে আসা কোম্পানির চাকুরেদের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিলিতি কেতার শিক্ষাও দিতেন।

লন্ডনের অকম্মার ঢেঁকি লক্কা পায়রাটি যে কলকাতায় এসে এরকম উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হয়ে উঠবেন, যা ছিল রইসি করার উপকরণ, তা হয়ে উঠবে তাঁর ব্যবসার মূলধন, এ নিশ্চয়ই জল-হাওয়ারই গুণ।

(চলবে)

রোববারের ক্রমশ



ব্রাত্য বসু

## পূর্বকথন

**‘প্রশ্ন’ মুখ থুবড়ে পড়ার পর শিশিরকুমারের আবারও টংঘরে সেই একার যাপন শুরু হল। ইতিমধ্যে নিউমোনিয়ায় ভাই বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর মৃত্যু ধসিয়ে দিয়েছিল শিশিরকুমারকে। বিশ্বনাথের শূন্যস্থান পূরণ করতে ব্যর্থই হলেন তাঁর ছোট ভাই হৃষীকেশ ভাদুড়ী। অন্যদিকে, শিশিরের প্রিয় নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ চারদিক থেকে ধাক্কা খাচ্ছিল। তার মধ্যেই বর্মায় মজুত— আহত, হতোদ্যম সেনাদের উজ্জীবিত করে যুদ্ধে যাওয়ার তোড়জোড় করলেন নেতাজি।**

পর্ব ৪৮

ডিসেম্বরের শেষ দিকে হু হু করে ভারতীয় সৈন্য বর্মায় ঢুকতে শুরু করল। জাপানি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মিলিত প্রতিরোধ তাদের ঠেকাতে পারল না। ফৌজের সেই পুরনো প্রবণতা আবার মাথা চাড়া দিল। অর্থাৎ, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভোঁ-ভাঁ পলায়ন। ফেব্রুয়ারি মাসে নেতাজি আজাদ হিন্দ ফৌজের তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ অফিসারদের নিয়ে বর্মার বিখ্যাত নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরি, প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচু মান্দালয়ের মাউন্ট পোপা-র পাদদেশে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বুঝলেন, ইংরেজ তথা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পরাজয় অনিবার্য।

এরই মধ্যে ২১ জানুয়ারি হঠাৎ টোকিওতে দীর্ঘদিন প্রথমে ডায়াবেটিস ও পরে যক্ষ্মা রোগে চরম অসুস্থ হয়ে রাসবিহারী বসু মারা গেলেন। জাপানে রয়ে গেলেন রাসবিহারীর জাপানি স্ত্রী তোশিকো, ছেলে মাসাহিদে এবং কন্যা তেৎসুকো। ছেলে মাসাহিদে বসু অবশ্য তার মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে, পিতার মৃত্যুর ছ'-মাসের মধ্যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনে নিহত হয়। ২৩ জানুয়ারি বর্মাতে জীবিত নেতাজির শেষ জন্মদিন পালিত হল। ওদিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফৌজের ধারাবাহিক গণপলায়ন অব্যাহত আছে। এপ্রিলে মাউন্ট পোপা-য় আত্মসমর্পণ করলেন নেতাজির প্রিয় সামরিক অফিসার প্রেমকুমার সায়গল। মে মাসে আরও দুই জবরদস্ত অফিসার শাহনওয়াজ খান ও গুরুদয়াল সিং ধীলোঁ দক্ষিণ বর্মার নদীশহর পেগু-তে আরও ৫০ জন সৈন্যের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করলেন। তিন বছর আগে, '৪১ সালের ডিসেম্বরে মালয়ের গভীর অরণ্যে যে স্বপ্ন প্রভূত উদ্দীপনা নিয়ে শুরু হয়েছিল, সাড়ে তিন বছর পর আত্মসমর্পণ ও নৈরাশ্যজনক পরাজয়ে তা শেষ হল ১৯৪৫-এর মে মাসে, বর্মার জঙ্গলে। ভগ্নমনোরথ, বিধ্বস্ত নেতাজি গেলেন প্রথমে ব্যাংকক এবং অতঃপর জুন মাসে সিঙ্গাপুর। অগাস্টের ৬ তারিখে আমেরিকা হিরোশিমায় বোমা ফেলল, যুদ্ধও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়ে গেল।

তাইহোকুতে নেতাজির বিমান-দুর্ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হবিবুর রহমান পরে বলেছিলেন, তাঁদের ওই জাপানি বম্বার প্লেন দুপুর দুটোয় আকাশে উড়লেও, কিছুক্ষণ পরেই প্লেনটির একটি প্রপেলার ভেঙে যায়। বিমানচালক সেই ধাক্কা সামলাতে পারেননি। বিমানটি তারপর একেবারে সোজা লম্বালম্বি মাটিতে আছড়ে পড়ে। প্লেনের মধ্যে নেতাজির পিছনে বসা হবিবুরও প্রপেলার ফাটার ওই বিকট শব্দে চমকে উঠেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই কোনও শত্রুবিমান তাঁদের বিমানের দিকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করছে। কিন্তু তারপরেই সশব্দে বিমানপতনের সঙ্গে তিনি চেতনা হারান। কিছুক্ষণ পরে হবিবুরের জ্ঞান ফিরে আসে ও তিনি কোনওরকমে ওই খণ্ড-বিখণ্ড বিমানের ধ্বংসস্তূপ থেকে নেতাজিকে বের করে আনেন। নেতাজি তখন শুধু জীবিতই নন, আছেন সজ্ঞানেও। তাঁর সুতির খাকি মিলিটারি পোশাক সম্পূর্ণ দাউদাউ করে জ্বলছে। বিমানের বাইরে এসে নেতাজি তাঁর আধপোড়া বুশকোটের বেল্ট খুলে বেরনোর চেষ্টা করছিলেন।

হবিবুর তাঁকে কোনওরকমে সাহায্য করতে গেলেন, হবিবুরের হাত দু'টি সম্পূর্ণ পুড়ে গেল, কিন্তু তিনি নেতাজির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সেই মুখ লোহার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আর আগুনে ঝলসে যাওয়া। কয়েক মুহূর্ত, তারপর দু'জনেই তাইহোকুর এয়ারফিল্ডের মাটিতে পড়ে গিয়ে চৈতন্য হারালেন।

সেদিন সন্ধেবেলায় দু'জনেরই কোনওরকমে জ্ঞান ফিরেছিল। তখন তাঁরা মিলিটারি হাসপাতালে শুয়ে। ডাক্তাররা অমানুষিক পরিশ্রম করছেন তাঁদের বাঁচাতে। কিন্তু তাঁদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও, সেদিন রাত ন'টায় নেতাজি শেষ শ্বাস ত্যাগ করেন। ২০ অগাস্ট নাকি তাইহোকুতেই হবিবুরের উপস্থিতিতে নেতাজির দাহকার্য সম্পন্ন হয়। পরের দিন টোকিওতে কোনওমতে আধা-সুস্থ হবিবুর নেতাজির চিতাভস্ম নিয়ে এলে, ৪ সেপ্টেম্বর টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে জাপানিরা পূর্ণ মর্যাদায় সুভাষচন্দ্র বসুর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন। এবং চিতাভস্ম সেই মন্দিরেই রাখা হয়, যা এখনও সেখানে আছে।

কিন্তু এটা হবিবুরের ভাষ্য। সুভাষচন্দ্র বসুর পুরো জীবনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অন্তর্ধানের 'মিথ' এতভাবে জড়িয়েছিল যে, অনেকেই এই গল্প বিশ্বাস করতে চাননি। এটিও পরে সারা ভারতে বিখ্যাত 'নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য' জনশ্রুতির জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আর ফেরেননি। হবিবুর রহমানও দেশভাগের পর পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি মিলিটারিতে যোগ দেন ও শেষ পর্যন্ত ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হয়ে অবসর নেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে নেতাজির মৃত্যুরহস্য নিয়ে ভারত সরকার তিনটি কমিশন গঠন করলেও, তার নিট রেজাল্ট শূন্যই থেকে যায়। নেতাজিও বাংলা ও বাঙালির ভাগ্যাকাশে এক সুদূর ধ্রুবতারা হয়েই জ্বলজ্বল করতে থাকেন।

ওই বছরের মার্চ মাসের গোড়ায় কলকাতায় হঠাৎ সমস্ত দোকানে সিগারেটের আকাল শুরু হয়। শুধু সিগারেট নয়, বিড়ি, চুরুট, সিগার, অর্থাৎ যাবতীয় তামাকজাত নেশাদ্রব্য হঠাৎ বাজার থেকে হাওয়া হয়ে যায়। খবরের কাগজ এই ঘটনাকে আখ্যা দিয়েছিল 'সিগারেট ফেমিন' তথা সিগারেটের মন্বন্তর বলে। স্বাভাবিকভাবেই শহরের যাবতীয় নেশাড়ুরা বিপুল সমস্যায় পড়ে। দিন সাতেক এই অবস্থা চলেছিল। শিশিরকুমার-ভ্রাতা বিশ্বনাথ তখন হাসপাতালে ভর্তি, আর ক'দিন বাদেই তিনি মারা যাবেন। যমে-মানুষে তখন টানাটানি চলছে। শিশিরকুমারের মাসান্তের চুরুটের অর্থ বিশ্বনাথ ভিখাকে একবারে দিতেন ও ভিখা সেটা খেপে-খেপে তুলে রাখত। কিন্তু বিশ্বনাথের অসুস্থতার সময় কোনওভাবে ভিখা একহপ্তার চুরুট তুলতে ভুলে গিয়েছিল। ফলে, সে-সময় ব্যাপক সমস্যায় পড়েছিলেন শিশিরকুমার। দিন তিনেক অ্যাশট্রে-তে পড়ে থাকা পোড়া চুরুটের ভগ্নাবশেষ খুঁজে-পেতে খেয়ে তাঁকে কোনওমতে কাটাতে হয়েছিল। ভিখা কোনওরকমে সুকিয়া স্ট্রিটের মোড়ে একটি বড় সিগারেটের দোকান থেকে মার্কিন টমি সৈনিকদের জন্য রাখা একবাক্স কেন্টাকি চুরুট কিনে এনে শিশিরকুমারকে দিয়েছিল। শিশিরকুমারও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। তারপর থেকে কিছুদিন নিজের হাতে চুরুট কিনতেন শিশিরকুমার। শ্রীরঙ্গমের রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটের কাছেই ডালিমতলা আর হোগলকুড়িয়ার ক্রসিংয়ে একটি বড় সিগারেটের দোকান ছিল। সেখান থেকেই শিশিরকুমার তাঁর এই শখের নেশার সামগ্রীটি সংগ্রহ করতেন।

গত বছরের ২০ ডিসেম্বর শ্রীরঙ্গমে শরৎচন্দ্রর উপন্যাস অবলম্বনে 'বিন্দুর ছেলে' প্রযোজিত হয়েছিল। উপন্যাসের নাটকরূপ দিয়েছিলেন আদতে নদিয়ার রানাঘাটের ছেলে তরুণ নাটককার দেবনারায়ণ গুপ্ত। মূল পুরুষ চরিত্র যাদবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সেই মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। অন্নপূর্ণা তথা বড় বউ সেজেছিলেন প্রভাদেবী। কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন বিন্দুর ভূমিকায় কমবয়সি অভিনেত্রী পক্ষী ওরফে সাবিত্রী। শিশিরকুমার বিন্দুর চরিত্র অত্যন্ত যত্ন করে বুঝিয়েছিলেন পক্ষীকে। সকলেই বলেছিলেন, এই অভিনয় ভোলা যায় না। পরে মনোরঞ্জন রঙমহলে অন্য থিয়েটার করতে চলে গেলে, কয়েকরাতের জন্য শিশিরকুমার যাদবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মোটের ওপর, 'বিন্দুর ছেলে' থিয়েটার ভালই চলছিল। কিন্তু চলতে-চলতেই বিশ্বনাথ অসুস্থ হলেন। তারপর ওই ঘটনা।

১৯৪৫-এর ২৩ অগাস্ট, বৃহস্পতিবার। শিশিরকুমার সন্ধে ছ'টা নাগাদ তাঁর শ্রীরঙ্গমের পিছনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হলের পাশের গলি দিয়ে রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে উঠে মৃদু মন্থর গতিতে হোগলকুড়িয়ার ক্রসিংয়ে তাঁর উদ্দিষ্ট সিগারেটের দোকানটির কাছে এলেন। সিগারেট বিক্রেতাটির নাম ছিল আশুবাবু। আশুবাবু শিশিরকুমারকে দেখে পরিচিত হাসিটি হাসলেন। বিকেলে এ চত্বরে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। সন্ধের আকাশ এখনও খানিক ভারী হয়ে আছে। রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে কিছু দিন আগে নতুন ঢালাই হয়েছিল। ফলে, বৃষ্টির জল পড়ে নতুন রাস্তা একেবারে চকচক করছে। রাস্তায় স্ট্রিট লাইট অল্প অল্প করে জ্বলতে শুরু



করেছে। শিশিরকুমার আশুবাবুর সিগারেটের দোকানের পাশে ছোট গুমটি-টির সামনে এসে দাঁড়ালেন। এই গুমটি-টি একটি চায়ের দোকান। স্থানীয় বাসিন্দা ষষ্ঠী সামন্ত এই দোকানটি কিছু দিন আগে এখানে খুলেছিলেন। এখন সেটি ভালই জমে উঠেছে। থিয়েটার বা মহড়া না থাকলে, শিশিরকুমার মাঝে মাঝে সন্ধেবেলায় এই হোগলকুড়িয়া-ডালিমতলা ক্রসিংয়ে এসে চা ও সিগার খান। এখনাকার খদ্দেররা বেশিরভাগই স্থানীয়, দেহাতি, হিন্দুস্তানি। পেশায় গাড়োয়ান, রিকশাওয়ালা বা ভুজাওয়ালা। তারা শিশিরকুমারকে চিনলেও তাঁর সামাজিক ওজন সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল নয়। ফলে শিশিরকুমার অনেকটা নিশ্চিন্তে চা খেতে পারেন।

আজকেও শিশিরকুমার ষষ্ঠীবাবুর দোকানে এক ভাঁড় চা অর্ডার করে, আশুবাবুর দোকান থেকে তাঁর দৈনন্দিন অভ্যেসের একটি লালচে-কালো মন্টেক্রিস্টো সিগার কিনলেন। আশুবাবু প্রতিদিনই তাঁর দোকানের পাশেই একটি জ্বলন্ত নারকেল দড়ি ঝুলিয়ে রাখেন। শিশিরকুমার সেটিতে তাঁর চুরুটটি ধরিয়ে ষষ্ঠীবাবুর দোকানে হেঁটে এসে একটি বড় ভাঁড়ের চা নিলেন। চায়ে একটি আরামের চুমুক দিয়ে হঠাৎ দেখলেন, আশুবাবুর দোকানের রেডিওয় সন্ধের খবর হচ্ছে। বেশ কিছু লোক সেটি শুনতে আস্তে-আস্তে ভিড় বাড়াচ্ছে। প্রত্যেকের মুখে বেশ উদ্বিগ্ন ভাব। শিশিরকুমারের কৌতূহল হল। তিনিও ধীর পায়ে আশুবাবুর দোকানের দিকে এলেন। একটু পরেই তিনি শুনলেন, সংবাদ-পাঠক জানাচ্ছেন, ফরমোসা (তাইওয়ান) দ্বীপে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে। খবরটা শুনে বুক কেঁপে উঠল শিশিরকুমারের। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হল খবরটা ভুয়ো, মিথ্যে। কিন্তু তাঁর মন বলছিল, হয়তো এবারের অন্তর্ধান চিরন্তন হবে। আর কোনও দিন ফিরবেন না তাঁর প্রিয় স্বদেশনেতা সুভাষচন্দ্র।

সেদিন রাত্রে আর কিছু খেলেন না শিশিরকুমার। গুম হয়ে ওই শ্রীরঙ্গমের টংঘরে বসে রইলেন গভীর রাত পর্যন্ত। সেদিনই সারা কলকাতা এবং সারা দেশ এই খবর পেয়েছিল। খবরের কাগজে খবরটি বেরয় পরের দিন।

সুভাষচন্দ্রর সঙ্গে কোনও দিন সামনাসামনি আলাপ হয়নি শিশিরকুমারের। দূর থেকে দু'-একটা জনসভায় দেখেছেন। আর একবার প্রায় আট বছর আগে, '৩৭ সালের এপ্রিল মাসে শিয়ালদহের কাছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 'প্রবাসী'-র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সুভাষচন্দ্রকে এক বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মাত্র কয়েক দিন আগে মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্র ইংরেজদের জেল থেকে বেরিয়েছেন। খুবই অসুস্থ তখন তিনি। সুভাষচন্দ্র একবছর আগে ইউরোপ থেকে বম্বেতে ফিরেছিলেন। প্রায় এক মাসের জাহাজযাত্রা। সদ্য-পরিণীতা স্ত্রী এমিলি শেংকলের তথ্য কেউ-ই তখনও জানেন না। এমিলির সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্য সুভাষচন্দ্রর মন তখনও পর্যাপ্ত কাতর। জাহাজে থাকতে এমিলিকে পরপর চিঠি লিখে চলেছেন সুভাষচন্দ্র। এই অবস্থায় ৮ এপ্রিল সুভাষচন্দ্রর জাহাজ বম্বের বন্দরে এসে ভিড়ল। সুভাষচন্দ্র নামতেই ইংরেজ পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেফতার করে প্রথমে বম্বের আর্থার রোড জেলে ও অতঃপর পুণার সেই জারবেদা জেলে নিয়ে গিয়ে ভরে দিল। '৩৭ সালের জানুয়ারিতে বন্দি অবস্থায় অসুস্থ সুভাষকে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে রাখা হয়েছিল। ১৭ মার্চ তিনি কারামুক্ত হয়েছিলেন। তারপরে এপ্রিলে ওই সংবর্ধনা।

প্রায় তিন বছর পর কলকাতার মানুষ সেদিন স্বচক্ষে তাদের প্রিয় নেতাকে দেখতে পেয়েছিল। স্বভাবতই প্রচুর ভিড় হয় সেদিন। প্রায় একলক্ষ জমায়েত। শিশিরকুমারও শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সেদিনের মিটিং শুনতে গিয়েছিলেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উল্টোদিকে বৈঠকখানা রোডে তাঁর সম্প্রদায়ের এক তরুণ অভিনেতার বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির জানালা থেকে শিশিরকুমার সেদিনের মিটিং শোনেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ভেতরে তিনি যেতে পারেননি, অনেকেই তাঁকে চিনে ফেলত। ভেবেচিন্তেই এই বন্দোবস্তটি করেছিলেন শিশিরকুমার। সুভাষচন্দ্রর বক্তৃতাটি সেদিন তাঁকে মুগ্ধ করে। তাঁর মনে হয়েছিল, ইনিই ভবিষ্যতের বঙ্গদেশের পরিত্রাতা হতে চলেছেন।

সুভাষচন্দ্র কোনও দিন কলকাতার কোনও থিয়েটার হলে থিয়েটার দেখতে যাননি। তিনি 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু' হয়ে ওঠার পরে তো যানইনি। একবছর আগে ভিয়েনায় যখন ছিলেন, এমিলির সঙ্গে হয়তো এক-আধটা অপেরা দেখতে গিয়ে থাকলেও যেতে পারেন। কিন্তু শিশিরকুমারের নাম নিশ্চয়ই তিনি শুনেছিলেন। তাঁর যৌবনে কলকাতার সংস্কৃতি-জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ নাম শিশিরকুমার। শিশিরকুমারও তাই দূর থেকে সুভাষচন্দ্রকে নিবিড়ভাবে পছন্দ করলেও, কখনও তাঁর কাছে যাওয়ার কথা বা গিয়ে আলাপ করার কথা কখনও ভাবেননি। সুভাষচন্দ্রর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে অবশ্য ভাল করেই চিনতেন শিশিরকুমার। ঘনিষ্ঠ আলাপও ছিল। বস্তুত শিশিরকুমারের থিয়েটার দেখা শুরু করেই বঙ্গ থিয়েটারের সঙ্গে খানিক ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল চিত্তরঞ্জনের। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোনও রাজনৈতিক মানুষের সঙ্গে আলাপে খানিক অনীহই থাকতেন শিশিরকুমার।

সুভাষচন্দ্রর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খানিক আলাদা ছিল। শিশিরকুমার মনে-মনে তাঁকে নিবিড়ভাবে ভরসা করতেন। সেই ভরসা একদিকে যেমন রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ছিল, তেমনই তা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। অর্থাৎ, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে শিশিরকুমারের বিশ্বাস ছিল, সুভাষচন্দ্র বসুই একদিন হয়ে উঠবেন প্রধান ঋত্বিক। তাঁর সংগ্রামী মানসিকতা, আপসহীন মনোভাব, এক প্রকৃত যোদ্ধার অবিরাম লড়াইয়ের ক্ষমতা, এসবই আসলে দেশের স্বাধীনতা আনবে এবং সুভাষচন্দ্রই হবেন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নতুন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। এই রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত সামান্য গোপন ব্যক্তিগত ইচ্ছেটুকু ছিল এই যে, স্বাধীনতা অর্জনের পর নেতাজিই একমাত্র

**আশুবাবুর দোকানের রেডিওয় সন্ধের খবর হচ্ছে। বেশ কিছু লোক সেটি শুনতে আস্তে-আস্তে ভিড় বাড়াচ্ছে। প্রত্যেকের মুখে বেশ উদ্বিগ্ন ভাব। শিশিরকুমারের কৌতূহল হল। তিনিও ধীর পায়ে আশুবাবুর দোকানের দিকে এলেন। একটু পরেই তিনি শুনলেন, সংবাদ-পাঠক জানাচ্ছেন, ফরমোসা (তাইওয়ান) দ্বীপে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে। খবরটা শুনে বুক কেঁপে উঠল শিশিরকুমারের।**

শিশিরকুমারের প্রকৃত বেদনাকে সম্যক অনুধাবন করবেন এবং তাঁর জন্য রাষ্ট্রীয় খরচে জাতীয় গরিমা-বৃদ্ধিকারী এক জাতীয় নাট্যশালা তথা থিয়েটারি রেপার্টরি বানিয়ে দেবেন। ওই রেপার্টরির শীর্ষে থাকবেন শিশিরকুমার এবং স্বাধীনতা-উত্তর নব্য ভারতবর্ষে কৃষিবিপ্লব বা শিল্পবিপ্লবের মতোই এক সার্বিক নাট্যবিপ্লব সংঘটিত হবে। গোটা বঙ্গে তো বটেই, সমগ্র ভারতবর্ষে এমনকী, বিদেশে পর্যন্ত শিশিরকুমারের ওই রেপার্টরি বিশেষ মনোযোগ আদায়ে সমর্থ হবে। নতুন রেপার্টরির তালিকায় সম্ভাব্য কর্মী বা কোনও দায়িত্বশীল ম্যানেজার হিসেবে নিজের আফিমখোর ছোট ভাই ওই বেয়াড়া হৃষীকেশটার নাম, স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী সুভাষচন্দ্র-প্রেরিত কোনও সরকারি আধিকারিকের কাছে তখন আদৌ দেবেন কি না, অত দূর অবশ্যও তখনও ভেবে উঠতে পারেননি তিনি! এইভাবে ব্যক্তির অভিপ্রায়ের সঙ্গে রাষ্ট্রের ভাল-মন্দ যেমন, তেমনই শিল্পচর্চারও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে রাষ্ট্রনায়কের নিজস্ব অভিপ্রায় ও রুচির ওপরে, তা শিশিরকুমার গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন।

কিন্তু নেতাজি যথারীতি নিরুদ্দেশের পথে অন্তর্ধান করলেন। তাঁর 'মৃত্যু' হল এবং সেই মৃত্যু ঘিরে একটি রহস্যময় জনশ্রুতির জন্ম হল, যা বছরের-পর-বছর জিইয়ে রাখা হল। আরও অনেকের মতো শিশিরকুমারেরও গোপন আধুরা স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটল। কিন্তু তখনও তিনি বঙ্গদেশে নিজের থিয়েটার বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে ছড়িয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে নীরবে লালন করে যাচ্ছেন। তাঁর সেই সাধের বঙ্গদেশও যে আর থাকবে না, সামনেই ভেঙে দু'-টুকরো হবে, তা তিনি তখনও আঁচ করতে পারেননি। সমকালীন রাজনীতির অস্থির ঘূর্ণাবর্ত দেখে মাঝে মাঝে বরং এক বিভীষিকায় ভুগতেন, তাঁর সাধের বাংলা আদৌ অবিকৃত থাকবে তো?

কিন্তু সুভাষচন্দ্রর বিমান দুর্ঘটনার পর একবছরও গেল না, শিশিরকুমার এবং আরও অনেকের গোপন ভীতি একেবারে বাস্তব রূপ নিয়ে কলকাতা শহরে ফিরে এল। পরের অগাস্ট মাসেই শহরে ঘটল সেই কুখ্যাত 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং', তথা '৪৬-এর দাঙ্গা।

ইতিমধ্যে, ভারতের প্রভু ইংল্যান্ডের অন্তর্গত রাজনীতির পাশাখেলায় সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল হিটলারের মৃত্যুর তিন মাস বাদে যুদ্ধে জেতার পরেও, নিজের দেশের নির্বাচনে হেরে গো-ভূত হলেন। তিনি নিজে নির্বাচনে জিতলেও, তাঁর দল কনজারভেটিভ পার্টির সম্পূর্ণ ভরাডুবি হল। ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল লেবার পার্টি এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন শ্রমিক ও ভারতদরদি ক্লিমেন্ট রিচার্ড অ্যাটলি। চার্চিল যেমন ভারতকে স্বাধীনতা না-দেওয়ার ব্যাপারে একগুঁয়ে মনোভাব দেখাতেন, দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের নব্য বাসিন্দা অ্যাটলি ঠিক তার বিপরীত মনোভাব দেখালেন। তিনি তাঁর মন্ত্রিসভা তথা ক্যাবিনেট থেকে তিনজন প্রতিনিধিকে ভারতবর্ষে পাঠালেন, কীভাবে এবং কোন পন্থায় তাঁদের বৃহত্তম উপনিবেশকে স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে, তা নির্ধারণ করতে। তাছাড়াও তাঁদের কাজ হবে যাবতীয় নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে বিবদমান ভারতীয় নেতাদের একমত করানো। অর্থাৎ, তাঁরা নিছক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে থাকবেন, কীভাবে ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে সাধের স্বাধীনতাটি পেয়ে, কে কীভাবে দেশে ক্ষমতায় বসবেন, তা ভারতীয়দের নিজেদেরই বুঝে নিতে হবে। এই প্রথম ইংল্যান্ড তাদের সাবেকি, কীভাবে স্বাধীনতা আসবে, ইত্যাকার ফোঁপরদালালি থেকে সরে এল এবং ভারতীয়দের নিজস্ব মারামারির জটিলতার মধ্যে ঢুকবে না বলে স্থির করল। কিন্তু এর আগে এভাবে ব্রিটেনের তিনজন নামজাদা মন্ত্রী বা আধিকারিক এইভাবে স্বাধীনতার হাতে-গরম প্রতিশ্রুতি নিয়ে ও সংবিধান ইত্যাদি বিষয়ে সমাধান করার জন্য ভারতে আসেননি। ফলে দেশীয় সংবাদপত্রর বাজার সরগরম হয়ে উঠল।



অখণ্ড ভারতবর্ষও উৎসুক চোখে নতুন এই ক্যাবিনেট মিশনের গতিপ্রকৃতির দিকে চোখ তুলে চাইল।

তিন সদস্যবিশিষ্ট ক্যাবিনেট মিশনের তিন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ছিলেন ভারতসচিব ৭৫ বছর বয়সি পেথিক লরেন্স, ভারতে পুরনো পরিচিত সেই স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং ব্রিটিশ নৌবাহিনীর প্রধান অ্যালবার্ট আলেকজান্ডার।

১৯৪৬-এর জানুয়ারি মাসে ইংল্যান্ডের মন্ত্রিসভা তাদের ক্যাবিনেট মিটিংয়ে তাঁদের ভারতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। মিশন ভারতের মাটিতে পা রাখল মার্চ মাসের শেষে। পৌঁছেই তাঁরা তাঁদের কাজ শুরু করে দিলেন। দিল্লিতে অবস্থিত বড়লাট আর্চিবল্ড ওয়াভেল তিনজনের হাতে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিস্টিটা ধরালেন, তাতে দেখা গেল সামনের কয়েক হপ্তায় প্রায় ৪০০ গণ্যমান্য ভারতীয় নেতার সঙ্গে তাঁদের দেখা করতে হবে।

কিন্তু তিনজনেই জানতেন, আদত কথাবার্তাটা চালাতে হবে মূলত দু'জন গুজরাতির সঙ্গে। একজন নিঃসন্দেহে সেই কংগ্রেসের নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী;এবং অপরজন মুসলিম লিগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্না।

(ক্রমশ)

অলংকরণ প্রণবেশ মাইতি

রোববারের মেগা

# যে লেখে সে আমি নয়

**শ্রীজাত**

**সহলেখক ভাস্কর লেট**

## পূর্বকথন

**বাবা মাঝে মাঝে নিজের অফিসে নিয়ে যেত। ট্রামে করে যাওয়া ছিল ভারি মজার। তারপর সেখানে দেখতাম, ছাপাখানার কর্মযজ্ঞ। বাবার 'যুগান্তর' কাগজের অফিসেই আলাপ হয়েছিল কত যে দিক্‌পাল কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে! শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, মৃদুল দাশগুপ্ত। তখন অবশ্য এঁদের কারও লেখাই সেভাবে পড়িনি।**

পর্ব ২০

মা-বাবার সুবাদে গুণী ও কৃতী মানুষজনের সঙ্গে আলাপের ইতিবৃত্ত যখন বলতে শুরুই করেছি, তখন আর একজনের না বললে ভারি অন্যায় হবে। খুব সহজে অবশ্য তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়নি। কিন্তু ক্রমে তিনি ওতপ্রোতভাবে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যান, হয়ে ওঠেন দিশারি। মানুষটা আর কেউ নন— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

কী করে হয়েছিল তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়? আর-পাঁচটি মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ির ছেলের যেভাবে হয়েছে— একদম সেইভাবে। কাকাবাবু ও সন্তুকে নিয়ে লেখা উপন্যাস পড়ে।

তখন তো জানতাম না, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি, বাংলা উপন্যাসের মোড়-ঘুরিয়ে দেওয়া নাবিক, একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক! জানতাম শুধু এইটুকু তথ্য— প্রতি বছর পুজোর সময় প্রকাশিত শারদ সংখ্যায় তিনি আমাদের জন্য, মানে ছোটদের জন্য, উপন্যাস লেখেন, যার কেন্দ্রীয় চরিত্র কাকাবাবু। সত্যি বলতে কী, পুজোর সময়টা কাছাকাছি এলেই হাপিত্যেশ করে বসে থাকতাম— কবে ওই নির্দিষ্ট শারদ সংখ্যাটি বেরবে— কবে কাকাবাবুর গল্প পড়ব। কখনও কাকাবাবু আন্দামান চলে যাচ্ছেন, কখনও আবার কলকাতায় বসে তিনি চাঁদের পাথর চুরি যাওয়ার রহস্যোন্মোচন করছেন। প্রতিবার নতুন আখ্যান, নতুন মোচড়, নতুন করে ভালবাসার সঞ্চার। প্রতিবারই নিজেকে সন্তুর সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করতাম। কত আর বড় হবে! আমার চেয়ে একটুআধটু বেশি হয়তো। কিন্তু সে কেমন কাকাবাবুকে নানা বিষয়ে সাহায্য করে। আমিও যদি হতে পারতাম সন্তুর মতো!

কাকাবাবু পড়তে-পড়তে শেষে এমন অবস্থা হল, মনে হতে লাগল, কাকাবাবুর লেখকের সঙ্গে দেখা না করলেই নয়! কখনও মা-বাবাকে জোরাজুরি করিনি কোনও খ্যাতনামা মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেই নিয়মটা ভেঙে ফেলতে দ্বিধা হয়নি। কেননা, যিনি কাকাবাবুকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তো নেহাত রহস্য-রোমাঞ্চ আবৃত একটা গল্প বলছেন না, বরং আলগোছে কাকাবাবুর প্রতিটি আখ্যানে জীবনবোধ এবং নৈতিকতার বীজও বুনে দিচ্ছেন। সেসব আমি কুড়িয়ে নিতে চেষ্টা করতাম।

পুজোসংখ্যার পাতায় একজন চিত্রশিল্পীর অসামান্য সব অলংকরণ থাকত। সেগুলো দেখেই কাকাবাবুকে চেনা ও কাকাবাবুর চেহারাটিকে মনের পাতায় এঁকে নেওয়া, বরাবরের জন্য। হয়তো সে কারণেই পরে যখন কাকাবাবুর চলচ্চিত্রায়ন হয়েছে— আমি কোনও অভিনেতাকেই ওই ভূমিকায় মেনে নিতে পারিনি। চওড়া গোঁফ ও প্রশস্ত কাঁধের কাকাবাবুকে ওই শিল্পী যেমন করে এঁকেছিলেন পুজোসংখ্যার পাতায়, সেই মুখ-চোখ ও অ্যাটিটিউড খুঁজতে চেয়েছিলাম হয়তো। একই কথা সন্তুর বেলাতেও প্রযোজ্য। ছিপছিপে অথচ তীব্র মনের জোরের সন্তুকে ফুটিয়ে তুলবে কে— এই প্রশ্নটা আনাগোনা করত। সে-ই চিত্রশিল্পী, যাঁর কাছে আমার কৈশোর সর্বান্তঃকরণে ঋণী— তিনি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।



যাই হোক, একদিন বাবার কাছে আবদার জুড়লাম— এই দুই গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিতেই হবে। একজন লেখক, অন্যজন চিত্রশিল্পী। এঁরা পরস্পর পরিপূরক। এঁদের দু'জনের মিলিত চেষ্টায় কাকাবাবুর কাহিনি বই হয়ে ওঠে। বাবা শুনে বলল, তা কী করে সম্ভব? এঁরা অসম্ভব ব্যস্ত মানুষ। সময় না দিলে তো দেখা করা সেভাবে সম্ভব নয়। আমি বললাম, তোমার তো এত মানুষের সঙ্গে চেনাজানা। পারবে না এঁদের সঙ্গে দেখা করাতে? আমি তো এমন কথা রোজ-রোজ বলি না।

বাবা আমার আবদার কখনও ফেরাত না। তো, একদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র অফিসে। বুকের মধ্যে উত্তেজনা যেন হাতুড়ি পেটাচ্ছে। কিন্তু 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র ভেতরের গাম্ভীর্য দেখে একটু যেন ভয়ও পেয়ে গেলাম।

এ-ঘর ও-ঘর ঘুরছি। যে কোনও সময় দেখা হয়ে যেতে পারে কাকাবাবু ও সন্তুর লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এবং মুখ দেখলেই চিনতে পারব। তার কারণ, তাঁর মুখ আমি কাকাবাবুর বইয়ের শেষের দিকে দেখেছি। কালো চুল, সাদা জুলফি। হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন। হাতে সিগারেট।

হঠাৎ একটা ঘরে ঢুকে চোখ আটকে গেল।

একমনে লিখছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। দেখেই আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মনে হতে লাগল— আর কী, সামনাসামনি দেখা তো হয়েই গেল, এবার তবে পালাই। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে।

বাবা তাঁর সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাকাতেই বাবা ওঁকে একটা প্রণাম করল। সামনে দুটো চেয়ার ছিল। উনি বললেন, 'বোসো তপন, বলো কী খবর?'

বাবা বলল, 'নিজের জন্য ঠিক আসা নয়'— পাশেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম— আমাকে দেখিয়ে বাবা বলে যেতে থাকল— 'এ-ই হল আমার ছেলে শ্রীজাত। আর বলবেন না, কাকাবাবু পড়ে ও এত আপ্লুত, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল।'

শুনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর কাগজ-পেন সরিয়ে রেখে আমার সঙ্গে মিনিট পনেরো আড্ডা মারলেন নানা বিষয়ে। কোন স্কুলে পড়ি, কাকাবাবু কেন ভাল লাগে, কোন উপন্যাসটা সবচেয়ে প্রিয়— সব জানতে চাইলেন একটু-একটু করে। আমিও গড়গড়িয়ে বলে যেতে লাগলাম।

এখন বুঝি, উনি আসলে আমার ভেতরে একজন পাঠককে খুঁজছিলেন, যে নিয়ম করে কাকাবাবু পড়ে। তার থেকে এসব ছোট-ছোট প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে পারলে— উনি বুঝতে পারবেন যে, যাদের জন্য এত পরিশ্রম করে লেখা, তারা কীভাবে গ্রহণ করেছে তাঁর সৃষ্টিকে। খ্যাতি ও প্রতিপত্তির চূড়ায় উঠে যাওয়ার পরেও এই যে নিজের লেখার

ভাল-মন্দ জেনে নেওয়ার চেষ্টা এবং আত্মবিশ্লেষণের আগ্রহ— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে তা শিখতে হয় বইকি।

আমার একটা সরু খাতা ছিল। তাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা সই নিয়ে রাখলাম, যাকে বলে 'অটোগ্রাফ'। এরপর আমরা গেলাম আঁকার ঘরে।

সে এক আশ্চর্য জায়গা! একের-পর-এক শিল্পী সেখানে বসে শিল্পকর্মে ডুবে আছেন। ঘরটাকে চাঁদের হাট বলা যায়। সুব্রত চৌধুরী, কৃষ্ণেন্দু চাকী, দেবাশীষ দেব, অনুপ রায় প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকের আঁকা ওই পুজোসংখ্যার পাতায় বেরয়। ঘরটির এককোণে একমনে কাজ করছিলেন সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। দীর্ঘদেহী, কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুল, চোখে চশমা, আর কী অপূর্ব সুন্দর তাঁর হাসি।

এবার আমি নিজেই গিয়ে আলাপ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার নাম বুঝি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়?' উনি সম্ভবত এত ছোট কারও মুখে কখনও নিজের নামটা আগে শোনেননি। অবাক করা চোখে আমার দিকে তাকালেন, তারপর আমার পিছনেই দাঁড়ানো বাবার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল। বাবার সঙ্গে আগেই আলাপ ছিল। ফলে বুঝে গেলেন— আমাদের সম্পর্কটা পিতা-পুত্রের।

সেদিন অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলাম সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়কে। সেসব ভেবে এখন নিজেরই বিব্রত লাগে। মনে আছে, জানতে চেয়েছিলাম, 'আপনি কীসে কাকাবাবুর ছবি আঁকেন? জলরঙে, না, তেলরঙে? দেখে তো মনে হয় তেলরঙে!' উনি হেসে বলেছিলেন, 'না, জলরঙেই আঁকি। তবে এমন একটা টেকনিকে আঁকি যেন ছাপার পরে দেখলে মনে হবে তেলরঙে এঁকেছি। তুমি ঠিকই লক্ষ করেছ।'

জানতে চেয়েছিলাম, 'আমি কি আপনার পাশে বসে আপনার আঁকা একটু দেখতে পারি?' উনি হেসে অনুমতি দেন। কিছুক্ষণ বসে তাঁর আঁকা দেখলাম। সেই সময় উনি বড়দের কোনও একটা লেখার অলংকরণ করছিলেন। এরপর আনন্দবাজার পত্রিকা-র অফিসে থেকে বেরিয়ে এলাম।

মনে আরও কোনও আফশোস নেই। দুই গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার বাসনা যে পূর্ণ হয়েছে!

নাইন-টেনে পড়ার সময় থেকে নীরা-ঝড় আছড়ে পড়ে আমার ওপর। যত পড়ছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীরার কবিতা, তত মুগ্ধতা বাড়তে লাগল। মনে হতে লাগল, এরকম প্রেমের কবিতা বাংলায় হয়তো আর কেউ লেখেননি। 'সুন্দরের মনখারাপ মাধুর্যের জ্বর', 'নীরা, হারিয়ে যেও না', 'বাতাসে কীসের ডাক, শোনো'— একের পর এক পড়ছি ও আক্রান্ত হচ্ছি তাঁর কবিতার কুহকে।

এ-ই কি সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি ছোটদের জন্য কাকাবাবু লেখেন, আশ্চর্য! মানুষটা কী করে এত ভাল কবিতাও লেখেন! মনে হতে লাগল, আরও একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করা দরকার। কিন্তু এবার তো আর বাবাকে বলা যায় না। একবার বাবা দেখা করিয়ে দিয়েছিল। কাজেই এবারটায় যা করার নিজেকেই করতে হবে।

আমি করতাম কী, স্কুলের ব্যাগে ওঁর লেখা রোগা-রোগা কবিতার বই রাখতাম। আর, স্কুলের পর বিকেলের দিকে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র অফিসে চলে যেতাম। স্কুল ইউনিফর্ম পরেই। ভেতরে ঢুকতাম না, বাইরে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে থাকতাম। অপেক্ষা করতাম— কখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সিগারেট খেতে নামবেন!

দূর থেকে দেখতাম, বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল একঝাঁক নক্ষত্র সিগারেট খেতে ও গল্প করতে বেরিয়ে এসেছেন দফতর থেকে। রমাপদ চৌধুরী, দিব্যেন্দু পালিত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। একদিন ঠিক

**'আপনি কী করে যে এমন লেখেন?' বোকার মতো প্রশ্ন সন্দেহ নেই। শুনে উনি ম্যানড্রেকের মতো হেসে উঠলেন। যে-হাসির অর্থ জাদুকর কখনও প্রকাশ্যে বলে না। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?' আমি বললাম— 'না না। আপনাকে আমার নাম লিখতে হবে না। আপনি শুধু বইয়ে সই করে দিন।'**

করলাম, সাহস করে এগিয়ে গিয়ে দেখা করতেই হবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেদিন ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন দিব্যেন্দু পালিত ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। যেমন ভাবা, তেমন কাজ।

ল্যাম্পপোস্টের পাশ থেকে ছুটে গিয়ে ধাঁ করে একটা প্রণাম করলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। উনি যথারীতি অবাক। আমি তাড়াতাড়ি স্কুলের ব্যাগের ভেতর থেকে ওঁর লেখা দু'-তিনটে বই বের করলাম, 'সই করে দিন'।

উনি তখনও তাকিয়ে আমার দিকে। তারপর বললেন, 'দেখে তো মনে হয় স্কুলে পড়ো!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, স্কুলে পড়ি। তবে আপনার কবিতার বই না-পড়ে একটা রাতও কাটে না আমার। আপনি কী করে যে এমন লেখেন!'

বোকার মতো প্রশ্ন সন্দেহ নেই। শুনে ম্যানড্রেকের মতো হেসে উঠলেন। যে-হাসির অর্থ জাদুকর কখনও প্রকাশ্যে বলে না। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?' আমি বললাম— 'না না। আপনাকে আমার নাম লিখতে হবে না। আপনি শুধু বইয়ে সই করে দিন।' আসলে অত বড় একজন মানুষের সামনে নিজের নামটা উচ্চারণ করতে প্রবল কুণ্ঠা হয়েছিল।

এই ঘটনার বহু দিন পরে, যখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে নৈকট্য হয়েছে, ওঁর স্নেহ ও সান্নিধ্যে পেয়েছি, সেই সময় এক রবিবারের আড্ডায় ওঁকে বলেছিলাম, "আচ্ছা, আপনার মনে আছে স্কুল ইউনিফর্ম পরে একটি বাচ্চা ছেলে একবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র অফিসের বাইরে আপনার অটোগ্রাফ নিতে গিয়েছিল?" উনি বললেন, 'হুঁ, আবছা মতো একটু মনে পড়ছে বটে, কেন বলো তো?' আমি বললাম, 'ওই ছেলেটা আমি-ই।'

উনি এটা শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। জানতে চান, 'সেদিন নাম বলোনি কেন?' আমি বলেছিলাম, 'ঠিক এ-ই দিনটার জন্য। এই যে আজ, আপনাকে, ঘটনার কথাটা বলতে পারলাম আপনার সামনে বসে।'

এখন মাঝেমাঝে ভাবি, সেদিনের ওই কবিতা-মাখা সন্ধেগুলো না থাকলে আমি দুপুরের এই কড়া রোদ সত্যি সইতে পারতাম কি না। অত মহীরুহের ছায়া পেয়েছি বলেই হয়তো আজকের ধু ধু বালি ও উষ্ণ রোদের আঁচ পেরিয়ে যেতে পারছি।

(ক্রমশ)

অলংকরণ শান্তনু দে

# শল্য-চিকিৎসা

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

**‘আপনিই আমাকে বরণ করে এনেছেন। তারপর সব বুঝেও আপনি আমাকে যে-কাজ করতে বলছেন, তার চেয়ে আমার বাড়ি চলে যাওয়া ভাল।’ সারথ্যের প্রশ্নে শল্যের আত্মসম্মান যখন বিস্ফাররত, দুর্যোধন বুঝলেন শল্যকে শান্ত করবে অন্য উপমা। আর তা কর্ণ নয়। স্বয়ং মদ্ররাজেশ্বর।**



শল্যর সরল স্বভাবটুকু বোঝা যায় এইখানে। তাঁকে যে লোকে অনেক সম্মান করে, বন্দিজনের খ্যাতিতেই তিনি নিজের যশের সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছেন এবং নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন আপ্লুত হয়ে— এটা তাঁর সরলতা; কিন্তু এই সরলতার মধ্যেও তাঁর রাজজনোচিত আকার-ইঙ্গিতের বহিঃপ্রকাশ সংবৃত করে রাখার শক্তিটুকু নিশ্চয় লুকিয়ে আছে।

তবুও তাঁর সরলতাও কম নয়, নইলে দুর্যোধনের প্রস্তাবে অমন— ‘ঠাকুর ঘরে কে, কলা খাইনি’— গোছের একটা উত্তর আসে কেমন করে? শল্য দুর্যোধনকে বললেন— ‘কর্ণর সারথ্য করো’, এ-কথা বলে আপনি কিন্তু আমাকে অপমান করছেন, অথবা এমনও হতে পারে যে, বিপক্ষের লোক বলে আপনি নিশ্চয়ই আমায় সন্দেহ করছেন— অবমন্যসি গান্ধারে ধ্রুবং বা পরিশঙ্কসে— নইলে আমারই সামনে কর্ণকে আপনি আমার চেয়ে বড় যোদ্ধা বলে প্রশংসা করছেন— অস্মত্তোঽভ্যধিকং কর্ণং মন্যমানস্তং প্রশংসসি।

শুধু এটুকু বলেই শল্য থামলেন না। বিপক্ষের সৈন্যধ্বংস করার একটা ভাগের কথা দুর্যোধন বলেছিলেন, সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শল্য বললেন— যোদ্ধা হিসেবে কর্ণকে আমি নিজের সমান মনে করি না, আপনি বরং আমার ভাগে বেশি সৈন্য ধ্বংস করার বরাত দিন, আমি আজ দেখিয়ে দেব যুদ্ধ কাকে বলে— পশ্য বীর্যং মমাদ্য ত্বং সংগ্রামে দহতো রিপূন্।

নিজের অপরিমেয় শক্তি-সমাখ্যান করার জন্য শল্য এবার তাঁর দৃঢ়-পীন বাহু-দু’টি তুলে ধরলেন, নিজের ধনুক-

বাণ দেখিয়ে, গদা দেখিয়ে নানা শক্তি প্রদর্শন করে শল্য বললেন— আপনি আমাকে কর্ণর সারথ্য করতে বলে চরম অপমান করেছেন। এটা মনে রাখবেন যে, আমি কোনও সাধারণ ফালতু লোক নই, যে, যখন-যা-ইচ্ছে তা-ই করতে বলবেন, তাছাড়া আমি নিজের ইচ্ছেতেও আপনার পক্ষে যোগ দিতে আসিনি— ন চাহং প্রাকৃতঃ কশ্চিন্ন চাস্মি অধিগতঃ স্বয়ম্— আপনিই আমাকে বরণ করে এনেছেন। তারপর সব বুঝেও আপনি আমাকে যে-কাজ করতে বলছেন, তার চেয়ে আমার বাড়ি চলে যাওয়া ভাল। আমি ঘরে ফিরে যাব, আপনি অনুমতি করুন— আপৃচ্ছে ত্বাদ্য গান্ধারে গমিষ্যামি গৃহায় বৈ— এমন অপমান সহ্য করার পর আর আমি যুদ্ধ করতে চাই না।

এতখানি রাগ যে শল্য করলেন, তার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে, আর কতটুকু ভান আছে, তা বোঝা দুস্কর হতে পারে, বিশেষত যুধিষ্ঠিরের কাছে শল্যর প্রতিজ্ঞার নিরিখে এটা ভান বলেই মনে হয়। অন্যদিকে, শল্যর স্বভাবটা দেখুন, তিনি কিন্তু খুব সহজেই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন। যদি এটা ভানই হত, তাহলে দুর্যোধনের কাছ থেকে কর্ণর সারথ্য করার প্রস্তাব পাওয়া মাত্রই তো শল্যর লুফে নেওয়া উচিত ছিল;না কি শল্য যথেষ্টই ভান করতে পারেন, তিনি এতটাই বড় অভিনেতা যে, মনের মধ্যে সবটা গুঁজে রেখেও এমন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। আমার কিন্তু এটাকে অভিনয় বলে মনে হয় না, বরঞ্চ স্বভাবই মনে হয়— দুর্যোধনের অত্যাগ্রহে যেমন তিনি সাড়ম্বরে তাঁর পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, তেমনই পাণ্ডবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কের নিরিখে তাঁদের কাজটাও করে দেবেন বলেছেন। কর্ণর সারথ্য-প্রস্তাবে তাঁর প্রচণ্ড মানে লেগেছে এবং যেভাবে তিনি সব ছেড়ে বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছেন, সেখানেও ওই তাঁর স্বভাবের অনিশ্চয়তাই কাজ করে। বিশেষত ওই যে-কথাটা 'আমি নিজের ইচ্ছেয় এখানে আসিনি, আপনি আমাকে সসম্মানে ডেকে এনেছিলেন'— অতএব এখন এই সারথ্যের প্রস্তাবটা 'মার্সেনারি' বীর যোদ্ধার মানে লাগছে। তিনি বিদায় নিতে চাইলেন।

দুর্যোধন বুঝলেন শল্যর কোথায় লাগছে।

তাঁকে তৈলসিক্ত করে সবার ওপরে তোলা দরকার। দুর্যোধন বললেন— দেখুন, সারথ্যে নিযুক্ত করার ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা উদ্দেশ্য আছে। নইলে যুদ্ধশক্তিতে কর্ণ বা অন্য কোনও যোদ্ধা আপনার চেয়ে বেশি নন, এমনকী আপনার সামনে পড়লে স্বয়ং কৃষ্ণও আপনার তেজ সহ্য করতে পারবে না— ন চ মদ্রেশ্বর ত্বাং বৈ কৃষ্ণঃ সোঢ়ুঞ্চ শক্ষ্যতি। দুর্যোধন এবার শল্যকে কথা-মোহিত করার জন্য তাঁর পূর্বপুরুষদের সত্যবাদিতার প্রশংসা করলেন। এই পূর্ব সত্যবাদিতার কারণেই নাকি তাঁর আর-এক নাম 'আর্তায়নি'। 'ঋত' মানে সত্য, ঋত-ই যাঁদের 'অয়ন' অর্থাৎ আশ্রয়— তাঁর নাম ঋতায়ন, ঋতায়নের 'অপত্যং পুমান্' তদ্ধিত প্রত্যয়ে আর্তায়নি। আবার শল্য— মানে ছুরি-কাঁচি-অস্ত্র— যা থেকে শল্যচিকিৎসক বলি আমরা, শত্রুর ওপরে তিনি সেই অস্ত্রাঘাতের মতো বেদনাকর, অতএব তাঁর নাম শল্য। এসব নাম-ব্যাখ্যা দুর্যোধনের। তিনি শল্যকে প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন। শেষ-কথায় আবার সেই আবৃত্তি— কর্ণ, আমি, কৃষ্ণ— কেউ আপনার শক্তিমত্তার ধারে-কাছে নেই, তবু আমি আপনাকে এই সারথ্য করার কথা বলছি এই কারণে যে, যুদ্ধে আমি কর্ণকে অর্জুনের থেকে বড় বীর মনে করি, আর আপনাকে শুধু আমি নয়, সমস্ত লোক বলবে— আপনি কৃষ্ণর চেয়ে অনেক উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন— ভবন্তং বাসুদেবাচ্চ লোকোহয়মিতি মন্যতে। আর অশ্বহৃদয়-বিজ্ঞানে আপনি কৃষ্ণর চেয়ে দ্বিগুণ বুদ্ধি ধরেন— দ্বিগুণং

**কৃষ্ণর সঙ্গে মহারাজ শল্যর এমন একটা কিছু অন্তঃসলিল বিরোধিতা ছিল, যা বাইরে থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই। কিন্তু সেটা এমন একটা কিছু, যা এত কাল ধরে তাঁর মানসিক প্রতিযোগিতার ইন্ধন জুগিয়েছে এবং হয়তো সেই অন্তর্গূঢ় কারণেই তিনি নকুল-সহদেবের নিজের মামা হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় এখন পাণ্ডবদের বিপক্ষে যুদ্ধ করছেন।**

ত্বং তথা বেৎসি মদ্ররাজেশ্বরাত্মজ।

এতক্ষণে দুর্যোধন শল্য-মনস্তত্ত্বর একেবারে সঠিক জায়গায় আঘাত করেছেন। আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি— কৃষ্ণর সঙ্গে মহারাজ শল্যর এমন একটা কিছু অন্তঃসলিল বিরোধিতা ছিল, যা বাইরে থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই। কিন্তু সেটা এমন একটা কিছু, যা এতকাল ধরে তাঁর মানসিক প্রতিযোগিতার ইন্ধন জুগিয়েছে এবং হয়তো সেই অন্তর্গূঢ় কারণেই তিনি নকুল-সহদেবের নিজের মামা হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় এখন পাণ্ডবদের বিপক্ষে যুদ্ধ করছেন। আমরা এমন সংবাদও দুর্যোধনের মুখেই শুনেছি, যেখানে 'কৃষ্ণ' শব্দটি উচ্চারণ না করেও কৃষ্ণর বিশাল গুষ্টিকে ইঙ্গিত করে দুর্যোধন শল্যকে বলেছেন— সাত্বতবংশীয়রা সকলে মিলে আপনার বাহুবল সহ্য করতে পারেনি, সেখানে কৃষ্ণ আপনার চেয়ে বেশি শক্তিমান হবেন কী করে— তব বাহুবলাদ্ রাজন্ কিন্নু কৃষ্ণো বলাধিকঃ। সবচেয়ে বড় কথা, রথী যোদ্ধার চেয়ে গুণাধিক ব্যক্তিকে রথের সারথি হতে হয়। সেদিক থেকে কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের সারথি, তেমনই আপনাকেও কর্ণের সারথি হতে হবে— রথিনোহভ্যধিকো বীর কর্তব্যো রথসারথিঃ। দুর্যোধনের মুখে নিজের কৃষ্ণাধিক প্রশংসা শোনার পরেই শল্যের ক্রোধ প্রশমিত হল এবং তিনি বললেন— তুমি যখন সমস্ত রাজা এবং সৈন্যর মাঝখানে আমাকে কৃষ্ণের চেয়েও অনেক বড় বলে প্রশংসা করলে, তাতে আমি সন্তুষ্ট বোধ করছি— বিশিষ্টং দেবকীপুত্রাৎ প্রীতিমানস্ম্যহং ত্বয়ি। তুমি আর চিন্তা কোরো না, কর্ণ যখন পাণ্ডবাগ্রগণ্য অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তখন আমি তার সারথ্য-কর্ম করব, স্বীকার করলাম— এব সারথ্যমাস্থিষ্ঠে রাধেয়স্য যশস্বিনঃ। এই অঙ্গীকারের সঙ্গে-সঙ্গে শল্য কিন্তু এবার নিজের শর্তটাও সন্নিবেশ করে নিলেন কথার মাঝে। দুর্যোধন যতটা অত্যাগ্রহে তাঁকে কর্ণর সারথ্য-কর্মে স্বীকার করিয়েছেন, তাতে এই শর্তটা পুরে দেওয়া অত্যন্ত সহজ ছিল শল্যর পক্ষে এবং শল্য তাই সুযোগ বুঝে বললেন— আমি কর্ণর সারথ্য-কর্ম করব বটে, কিন্তু সারথ্য-কর্ম করতে করতে আমি আমার ইচ্ছানুসারে কথা বলব, সে-ব্যাপারে কিন্তু কিছু বলতে পারবে না বাপু— উৎসৃজেয়ং যথাশ্রদ্ধমহং বাচোহস্য সন্নিধৌ।

(ক্রমশ)

অলংকরণ শান্তনু দে

# দ্রুতি ও দূরত্ব

ভাস্কর লেট

**কেউ যদি কোনও ঘটনার সঙ্গে সংলিপ্ত হয়ে থাকতে চায়, রাস্তায় সে আস্তে হাঁটে। তার মনে হয়, মন্থর গতিতে চললে হয়তো পছন্দের ঘটনাটির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হবে না, সে ঘটনাটিকে মনে রাখবে।**

একজন মানুষ, যদি তার সঙ্গে সবে-ঘটা কোনও অনভিপ্রেত ঘটনাকে ভোলার চেষ্টা করে, তাহলে রাস্তায় হাঁটার সময় সে গতি বাড়াতে থাকে। কেননা, সে ধরে নেয়, অবাঞ্ছিত স্মৃতিটি আসলে তার খুব কাছেই রয়েছে। ধুকপুক করছে। সেজন্য তার অবচেতন মনে করে— জোরে হাঁটলে, উত্তরোত্তর গতি বাড়ালে, ওই নাছোড় স্মৃতির সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে, আর একসময় অপ্রিয় ও অপছন্দের ঘটনাটিকে সে ভুলে যেতে পারবে ঠিক।

আবার, এর উল্টোও হয়। কেউ যদি কোনও ঘটনার সঙ্গে সংলিপ্ত হয়ে থাকতে চায়, রাস্তায় সে আস্তে আস্তেই হাঁটে তখন। জোরে হাঁটে না। অবচেতনে সে মনে করে— মন্থর গতিতে চললে-ফিরলে হয়তো পছন্দের ঘটনাটির সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হবে না, সে ঘটনাটিকে বিস্মৃত হবে না। অর্থাৎ, 'দ্য ডিগ্রি অফ স্লোনেস ইজ ডিরেকশনালি প্রোপোরশনাল টু দ্য ইনটেনসিটি অফ মেমরি। দ্য ডিগ্রি অফ স্পিড ইজ ডিরেকশনালি প্রোপোরশনাল টু দ্য ইনটেনসিটি অফ ফরগেটিং।'

স্মৃতি এবং বিস্মৃতির সাদা-কালো চৌখোপে এইভাবে গতির রহস্যকে বুনে দিয়েছিলেন মিলান কুন্দেরা— 'স্লোনেস' উপন্যাসে। মনে রাখতে হবে, 'স্লোনেস' থেকে তিনি ফরাসিতে লিখতে শুরু করলেন, এরপর আর কখনও চেক ভাষায় লিখবেন না। এবং মৃত্যুর পরে ফরাসি সাহিত্যবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর মূল্যায়ন হোক— শেষাবধি এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হবেন। কাজেই, উপন্যাস বাদ দিয়ে ভাবলেও— এটি কুন্দেরার জীবনের সঙ্গেও অন্যভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে। এক ভাষার প্রশ্রয় ছেড়ে অন্য ভাষার বন্দরে নোঙর ফেলতে চললেন, প্রতিটি অনুভবকে আর চেক ভাষায় নয়, অনুভব করতে চাইলেন ও ভবিষ্যতেও চাইবেন ফরাসিতে, তাহলে একটু গতি-ও কি তাঁকে বাড়াতে হবে না— কাঙ্ক্ষিত দূরত্ব রচনার খাতিরে?

মিলান কুন্দেরা চলে গিয়েছেন আগের বছর। মৃত্যু-পরবর্তী আলোচনায় উঠে এসেছিল একটি পুরনো বিতর্ক। সর্বজনবিদিত যে, কুন্দেরা তেমন পছন্দ করতেন না ফিওদর দস্তয়েভস্কি-র লেখা। সেই না-পছন্দ ও বিরক্তি এতখানি প্রগাঢ় ছিল যে, একবার যখন প্রায় খেতে না পাওয়ার অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছেন— দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মতবিরোধের জেরে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়, অধ্যাপনার চাকরি নিয়েও টানাটানি পড়ে— সেই সময়টায়— একটি প্রস্তাব পেয়েছিলেন— দস্তয়েভস্কির 'দ্য ইডিয়ট' উপন্যাসের একটি নাট্য-উপস্থাপনা করার। অমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কুন্দেরা রাজি হননি। নিজেকে বিযুক্ত করে নেন সেই মঞ্চ করার 'অফার' থেকে। কেন? কীসের এত ক্ষোভ তাঁর দস্তয়েভস্কিকে নিয়ে? তিনি কি সার্বিকভাবে সোভিয়েত সাহিত্যের প্রতি বীতস্পৃহ, যেহেতু প্রাগ বিপ্লবের সময় সোভিয়েতি দাদাগিরিতে তাঁর দেশের বাইরের স্থিতি ও আন্তঃসৌন্দর্য তছনছ হয়ে গিয়েছিল?

> **কুন্দেরা ধরতে পারেননি দস্তয়েভস্কির লেখা। যেসব চরিত্রের দেখা মেলে, তারা 'মেটাফিজিক্যাল'। তাদের মূল্যমান অনেক বেশি কুন্দেরার লেখায় প্রাপ্ত আহত 'র‌্যাশনাল' চরিত্রদের চেয়ে।**

কুন্দেরা কিন্তু মনে করেন— নিছক সোভিয়েত সাহিত্যের বিরোধিতা এটা নয়, কারণ আন্তন চেখভকে তো তাঁর বেশ লাগে। সমস্যাটি আসলে একান্তভাবে দস্তয়েভস্কিকে ঘিরে। ফিওদরের উপন্যাসের যে-আবহ ও জলবায়ু, কুন্দেরার মনে হয়েছে তা এমনই সংক্রামক যে, সবকিছুকে তীব্র আবেগে রূপান্তরিত করে। এর ফলে সংকেত ও ইশারার ক্ষেত্রে ফাঁপানো অতিরঞ্জন চলে আসে, অনুভূতিকে আগ্রাসী মনে হয়।

এরপর যা হওয়ার, তা-ই হয়েছিল। দু'-ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল সাহিত্যের দুনিয়া। একপক্ষে ছিলেন জোসেফ ব্রডস্কি— নোবেলজয়ী কবি, সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনগ্রাদে জন্ম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা হন পরে, মাঝে একটা পর্যায়ে 'স্টেটলেস' বা দেশ ও রাষ্ট্র পরিচয়হীন জীবনও কাটিয়েছেন। তিনি প্রতিবাদ করেন। বলেন, কুন্দেরা নাকি ধরতেই পারেননি দস্তয়েভস্কির লেখার নির্যাস। কেননা, তাঁর লেখায় যেসব চরিত্রের দেখা মেলে, তারা 'মেটাফিজিক্যাল'। এবং তাদের মূল্যমান অনেক বেশি কুন্দেরার লেখায় প্রাপ্ত আহত ও অবমানিত 'র‌্যাশনাল' চরিত্রদের চেয়ে। আবার, পিটার পেত্রো পাশে দাঁড়ান কুন্দেরার। বলেন, কুন্দেরার কাছে দস্তয়েভস্কি এমন একটি 'সিম্বল', যিনি ইউরোপীয় ভাবধারার প্রকারভেদ। অথচ, মিলান কুন্দেরা যে নিজে ভীষণভাবে পূর্ব ইউরোপের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের স্বাতন্ত্র্যে মগ্ন। দস্তয়েভস্কিকে অস্বীকার করতে চাইলেও তাই কুন্দেরার উপন্যাসের অন্তর্কোষে দস্তয়েভস্কির প্রভাব যে নেই, এমনটা বলা যাবে না।

পুরনো এই প্রতর্ক আবারও নতুন করে উঠে আসে মিলান কুন্দেরার মৃত্যুর পর। এবার তাঁকে সমর্থন করেন আন্তন পুগাচ। যুক্তি চিরে চিরে দেখাতে দেখাতে তিনি একটা পর্যায়ে ফিরে যান কুন্দেরার 'স্লোনেস' উপন্যাসের মর্মে এবং কী সহজে বলে দেন— দ্রুতগামী হতে চাওয়ার মধ্যে 'ভালগারিটি' রয়েছে। কুন্দেরা এটাই বলতে চেয়েছিলেন। কারণ, দ্রুতি সবসময় স্মৃতিকে ছেড়ে বিস্মৃতিকে নিজের ভোটটি প্রদান করে।

রিল তৈরির এই ভার্চুয়াল জগতে অতএব নির্মাণ আছে। সৃষ্টির আড়মোড়া নেই। ক্ষণিকের ফাটলে ঘন ঘন ও মনোহীন তাড়নাপ্রহার আছে। আগুনে পুড়তে পুড়তে দীর্ঘ চুম্বনের যাতনা নেই। রিল তাই লক্ষ লক্ষ তৈরি হয়, হারিয়েও যায়। কিছু লাইক ও শেয়ারে শেষ হয় তার ইনস্টাচক্র। রিল স্মৃতির সঙ্গে সখ্য করে না, করতে চায়ও না, সে শুধু দ্রুত দূরে যেতে চায়।




পুরোনো সোনার গয়নার বদলে নতুন গয়না*

আমাদের সমস্ত হীরের গয়নাই পাবেন Certificate of Authenticity- সহ*

Golden Dreams- মাসিক স্বর্ণ সঞ্চয় প্রকল্প*

0% INTEREST EMI এর সুবিধা*

বিনামূল্যে বীমা পরিষেবা*

গিফ্‌ট কার্ড*

## আমাদের শোরুমগুলি

Bowbazar | Gariahat | Chowringhee | Ultadanga | Hatibagan | Behala | Garia | Jadavpur | New Town | Nager Bazar | Vivekananda Road | Family Mall (Sealdah Station) | Howrah Maidan | Barasat | Sodepur | Habra | Barrackpore | Uttarpara | Serampore | Chandannagar | Arambagh | Baruipur | Kanchrapara | Asansol | Balurghat | Bankura | Berhampore | Bishnupur | Burdwan | Cooch Behar | Durgapur (Benachity and City Centre) | Katwa | Krishnanagar | Malda (Kanir More & English Bazaar) | Midnapore (Sahabharang Bazar & Keranitala) | Purulia | Raiganj | Rampurhat | Siliguri | Siuri | Tamluk

Agartala | Bhubaneswar | Bengaluru (Ulsoor, Koramangala & Marathahalli) | Delhi | Noida | Mumbai (Bandra & Vashi) | Pune | Jamshedpur | Ranchi | Patna | Silchar

**PCC Lites**- প্রতিদিনের Stylish গয়নার শোরুম, Mani Square Mall | Madhyamgram Chowmatha | Rink Mall, Darjeeling

pcchandraindia.com | amazon | | | | NYKAA | Follow us on | Customer Care: 8010700400 (Except Sunday)

sosideas